বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং
রাজ্যশিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ,
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর।

ওড়িশা প্রাথমিক শিক্ষা
কার্য্যক্রম প্রাধিকরণ
ভুবনেশ্বর

বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

লেখকমণ্ডলী:
ডঃ হরিহর ত্রিপাঠী
ডঃ বিজয় কুমার পরিডা
শ্রী বিষ্ণু চরণ জেনা
শ্রী বৈকুণ্ঠ নাথ নায়ক
শ্রী ফকির চরণ স্বাইঁ
শ্রী কিশোর চন্দ্র মাহান্তি
শ্রী দিল্লিপ কুমার পণ্ডা

সমীক্ষকমণ্ডলী:
প্রফেসর জীবনকৃষ্ণ মহাপাত্র
ডঃ হরিহর ত্রিপাঠী
প্রফেসর বসন্ত কুমার চৌধুরী

অনুবাদক : প্রফেসর দিপাস্য কুণ্ডু
সমীক্ষক : শ্রীমতি সুচিত্রা দাস
সংযোজনা: ডঃ সবিতা সাহু

সংযোজনা:
ডঃ প্রীতিলতা জেনা
ডঃ তিলোত্তমা সেনাপতি
ডঃ সবিতা সাহু

প্রকাশক:
বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা

মুদ্রণ বছর: ২০২২

মুদ্রণ: পাঠ্যপুস্তক উৎপাদক ও সরকার বিক্রয়, ভুবনেশ্বর

প্রস্তুতি:
শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং রাজ্য শিক্ষা
গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

জগৎমাতার চরণে অদ্যাবধি আমি যা যা উপঢৌকন ভেট দিয়ে আসছি, তাদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা, আমায় সব থেকে বেশী ক্রান্তিকারী ও মহত্ত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। এর থেকে বড় মহত্ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ভেট, আমি যে জগৎ সম্মুখে রাখতে পারবো, তা' আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। এর মধ্যে আছে আমার সমগ্র রচনাত্মক কার্য্যক্রমকে প্রয়োগাত্মক করার চাবিকাঠি। যে নতুন দুনিয়ার জন্যে আমি ছটফট করছি, তা' এ থেকেই উদ্ভব হতে পারবে। এটাই আমার অন্তিম অভিলাষ বললে চলে।

মহাত্মা গান্ধী

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত

“জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত - ভাগ্য - বিধাতা
পাঞ্জাব - সিন্ধু- গুজরাট - মারাঠা
দ্রাবিড় - উৎকল - বঙ্গ
বিন্ধ্য - হিমাচল - যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয় গাঁথা
জনগণ-মঙ্গল দায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা,
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।”

সূচিপত্র

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
	খাদ্য	
প্রথম	খাদ্যের উৎস	০১
দ্বিতীয়	খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ	০৬
তৃতীয়	খাদ্য পদার্থের পরিষ্করণ	১৪
	বস্তু ও পদার্থ	
চতুর্থ	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বস্তু	১৮
পঞ্চম	বস্তুর প্রকারভেদ	২২
ষষ্ঠ	বস্তু ও পদার্থের পরিবর্তন	২৯
	জীবজগৎ	
সপ্তম	জীব ও নির্জীব	৩৭
অষ্টম	অবস্থান বা সংস্থা	৪১
নবম	উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্য	৪৬
	গতিশীল বস্তু	
দশম	দৈর্ঘ্য ও দূরত্বের পরিমাপ	৫২
একাদশ	গতি	৫৮
	বস্তু কাজ করে কীভাবে	
দ্বাদশ	বিদ্যুৎ	৬৩
ত্রয়োদশ	চুম্বক	৬৯
	প্রাকৃতিক ঘটনাবলী	
চতুর্দশ	প্রাকৃতিক ঘটনাবলী	৭৫
পঞ্চদশ	আলোক	৮০
	প্রাকৃতিক সম্পদ	
ষোড়শ	জল	৮৬
সপ্তদশ	জীবজগতের জন্য বায়ুর গুরুত্ব	৯১
অষ্টাদশ	আবর্জনা	৯৫

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমারা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তা, মত্‌প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতার; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহন করে, আমাদের গণপরিষদ। আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্‌দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

প্রথম অধ্যায়

খাদ্যের উৎস

প্রত্যেক জীবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ, প্রজনন ও মৃত্যু। এই সব কাজের জন্য তার খাদ্য আবশ্যক, কারণ সে খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। সেই শক্তি দিয়ে সে সব কাজ করে। সুতরাং খাদ্যকে জীবনধারণের উৎস বলে ধরা হয় ও এর সাহায্যে জীবনের সব মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়।

1.1 খাদ্যের প্রকার:

তুমি গত দুই দিন বাড়িতে যা খেয়েছ নিম্ন সারণীর ১.১ অনুসারে তোমার খাতায় লেখো।

সারণী ১.১ দুদিনে খাওয়া খাদ্য।

দিবস	খাওয়া খাদ্যের নাম (ছবি)
প্রথম	
দ্বিতীয়	

চিত্র 1.1 বিভিন্ন প্রকারেরে খাদ্য

সারণী দেখে আলোচনা করো। তুমি প্রত্যেকদিন সমান খাবার খাও কি? তোমার শ্রেণীর সবাই কি একই প্রকার খাবার খায়?

তোমার শ্রেণীর সকলের খাদ্যতালিকা অনুধ্যান করলে আমরা দেখব যে সকলেই প্রায় 'ভাত' খায়। তোমার ঘরে ভাত কীভাবে রান্না করা হয় তুমি তা দেখেছ কি? ভাত রান্নার জন্য কী প্রয়োজন?

1.2 খাদ্যের উপাদান ও উৎস

তুমি হয়তো দেখেছ, ভাতের জন্য চাল ও জল আবশ্যক। জলে চাল ফেলে রাঁধলে ভাত হয়। ভাত রান্নার জন্য চাল, জল ও তাপের প্রয়োজন হয়।

তুমি ও তোমার বন্ধুদের তৈরি খাদ্যতালিকা দেখো। ওতে থাকা প্রত্যেক খাদ্যের জন্য কী কী উপাদান প্রয়োজন সারণীতে ১.২ দেওয়া উদাহরণ দেখে লেখো।

সারণী ১.২ খাদ্য ও তার তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান

খাদ্যের নাম	প্রয়োজনীয় উপাদান
রুটি	আটা, জল, নুন
ডালমা	নানা রকমের সবজি, নারকেল, ডাল, তেল, নুন, জল, পেঁয়াজ, লঙ্কা, হলুদ

1.3 প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাদ্য তুমি সারণীটি পূরণ করবার পরে দেখবে যে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য আবশ্যক উপাদানে পার্থক্য দেখা যায়। এখন দেখব তোমার লিখিত উপাদানগুলি কোথায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কিছু উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় আর কিছু প্রাণী থেকে পাওয়া যায়। আবার কিছু উপাদান প্রাণী ও উদ্ভিদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তোমার সারণীতে ডালনার উপাদানগুলি হল নানা ধরনের সবজি, নারকেল, ডাল, তেল, মশলা, নুন, জল, পেঁয়াজ, লঙ্কা, হলুদ। এর মধ্যে জল ও নুন ব্যতীত সব উপাদান উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু জল ও নুন আমরা আমাদের আবশ্যকতা অনুসারে উদ্ভিদ থেকে পাই না। সেই রকম ডিমের তরকারিতে ব্যবহৃত ডিম প্রাণী থেকে যেমন পাই তেমনই তেল, মশলা ইত্যাদি উদ্ভিদ থেকে পাই। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে নুন অথবা জল পাওয়া যায় না।

তোমার লেখা খাদ্যতালিকা দেখো। সেই সব খাদ্যের উপাদানগুলি কোথায় পাওয়া যায় সারণী ১.৩-এ লেখো।

সারণী: ১.৩ বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও সেগুলির উৎস

খাদ্য	আবশ্যক উপাদান	কোথায় পাওয়া যায়		প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে না পাওয়া উপাদান
		প্রাণী	উদ্ভিদ	
খিচুড়ি	চাল, ডাল, গব্যঘৃত, নারকেল, সবজি, মশলা, নুন, জল, হলুদ	গব্যঘৃত	চাল, ডাল, নারকেল, সবজি, মশলা, হলুদ	নুন, জল

আমরা জানলাম, আমাদের খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান প্রধানত উদ্ভিদ থেকে পাই। কিছু খাদ্যে উদ্ভিদের মূল ব্যবহার করা হয়, অন্য কিছু খাদ্যে ফুল, ফল, বীজ, পাতা ও কাণ্ড ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে অনেক ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। একটি গাছের বিভিন্ন অংশ একই রকম খাদ্যে প্রায় ব্যবহৃত হয় না।

তুমি কি এমন কোনো গাছ জানো যার পত্র, ফুল, ফল ও কাণ্ড খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়?

চিত্র ১.২ এক লতা জাতীয় (গাছ) উদ্ভিদ

চিত্র (১.২)টি দেখো। এটি কি গাছ জানার চেষ্টা করো। গাছটি চেনার পরে এর কোন্ কোন্ অংশ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় বলো।

তোমার অঞ্চলে থাকা বিভিন্ন উদ্ভিদের কোন্ অংশ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় তার এক তালিকা করো।

সারণী ১.৪ উদ্ভিদ ও তার ব্যবহৃত অংশ

উদ্ভিদের নাম	খাদ্যে ব্যবহৃত হওয়া অংশ
সজনা	পত্র, ফুল, ফল
মূলা	
শসা	
পেঁয়াজ	

১.৪ অন্য জীব কী খায়

আমাদের মতো অন্য জীবরা খাদ্য খায় কি?

তোমার ঘরে গরু কিংবা ছাগল আছে। তারা কী খায়? কুকুর, বিড়াল ও মুরগি নিশ্চয় দেখেছ। তারা কী খায়?

তোমার দেখা জীবজন্তুদের নাম ও তারা কী খায়, তোমার খাতায় তার এক তালিকা করো। পরবর্তী সারণীতে জীবজন্তুরা কী কী খাদ্য খায় তোমাদের মধ্যে আলোচনা করে সারণী ১.৫-এ লেখো।

সারণী ১.৫ জীব ও তাদের খাদ্য

জীবের নাম	কী খায়
কুকুর	মাংস, ভাত, রুটি, দুধ
পায়রা	ধান, মুগ, বিরি ইত্যাদি শস্য
সিংহ	
মাছ	
মাকড়সা	
কাক	
প্রজাপতি	
মৌমাছি	
মাছি	
মশা	
খরগোশ	

সারণী ১.৫ দেখে কারা কেবল প্রাণীজাত খাদ্য, কারা কেবল উদ্ভিতজাত খাদ্য ও কারা উভয় প্রকার খাদ্য খায় আলোচনা করো।

তুমি জানলে, প্রত্যেক প্রাণী খাদ্য খায়। কিন্তু কতক জীব কেবল প্রাণী বা প্রাণীজাত খাদ্য খায়, কতক জীব কেবল উদ্ভিদ বা উদ্ভিতজাত পদার্থ খায় এবং আর কিছু জীব প্রাণী ও উদ্ভিদজাত পদার্থ উভয়ই খায়।

খাদ্য খাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রাণীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যারা শুধু উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত পদার্থ খায়, তারা শাকাহারী, যারা শুধু অন্য প্রাণীদের খায় তারা মাংসাশী এবং যারা উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই খায় তারা সর্বাহারী।

সারণী ১.৬-এ দেওয়া উদাহরণ দেখে প্রাণীদের নামের তালিকা করো।

সারণী ১.৬ প্রাণীদের বিভাগীকরণ

শাকাহারী	মাংসাশী	সর্বাহারী
খরগোশ	সিংহ	কুকুর

কী শিখলাম:

- আমরা পৃথক পৃথক খাদ্য খাই।
- খাদ্য প্রধানত প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরির জন্য পৃথক পৃথক উপাদান প্রয়োজন।
- খাদ্য অভ্যাস অনুসারে প্রাণীদের শাকাহারী, মাংসাশী (মাংসাহারী) ও সর্বাহারী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।
- কোনো খাদ্য তৈরির জন্য আবশ্যক জিনিসকে সেই খাদ্যের উপাদান বলা হয়।
- মানুষকে সর্বাহারী বলা হয়।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলির কোন্ কোন্ অংশ আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করি লেখো।

উদ্ভিদের নাম	কোন্ অংশ খাদ্যরূপে ব্যবহার করি
টম্যাটো	
কলা	
আম	
নারকেল	
পেঁয়াজ	
আখ	
আদা	
পুঁই	
শিম	
ডাঁটা	

২. নীচে অল্প কিছু খাদ্যের নাম দেওয়া হয়েছে। সেই খাদ্যের উপাদানগুলির নাম লেখো।

খাদ্যের নাম	খাদ্য তৈরির জন্য আবশ্যক উপাদান
কেক	
ক্ষীর গজা	
রসগোল্লা	
পাঁচমেশালী তরকারি	
কাঁকড়া	
সুজির হালুয়া	
আইসক্রিম	

৩. (ক) পোড়াপিঠা তৈরির জন্য আবশ্যক উপাদানগুলির নাম লেখো।

(খ) ওই সব উপাদান কোথায় পাওয়া যায় উপযুক্ত ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

উপাদান	প্রাণী থেকে পাওয়া যায়	উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়

৪. নিম্নোক্ত জিনিসের মধ্যে দু'টি পার্থক্য ও দু'টি সামঞ্জস্য লেখো। পাকা পেঁপে ও কাঁচা পেঁপে।

৫. 'ক' স্তম্ভের প্রত্যেক খাদ্যের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের সম্পর্কিত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে জুড়ে দাও।

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
ঘি	বিউরী গাছ
মধু	গমের গাছ
আচার	আখ গাছ
বড়ি	তাল গাছ
রাবড়ি	সরষে গাছ
হালুয়া	মুরগি
পকোড়ি	গরু
বিরিয়ানী	মেথি গাছ
	ফুল গাছ
	বট গাছ
	ছাগল

৬. (ক) পালং শাক দিয়ে যে যে খাবার তৈরির জন্য উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে পাঁচটির নাম লেখো।

(খ) ডিম যে যে খাবার তৈরির জন্য উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয় তাদের নাম লেখো।

৭. তোমার অঞ্চল থেকে যদি আজ সব পোকা, মাছি লোপ পায়, তবে যে যে জীবজন্তুর খাদ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধা হবে তার মধ্যে পাঁচটির নাম লেখো।

বাড়িতে বসে করো:

- তোমার গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে ওই পরিবারের সদস্যরা যা খায় সেই খাদ্যের তালিকা করো।
- তোমার বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরবের নাম লেখো। প্রত্যেক পরবে কী ধরনের খাবার তৈরি করা হয় তার তালিকা করো। ওই সব খাদ্যসামগ্রীতে ব্যবহৃত উপাদানগুলির নাম লেখো।
- তোমার বাড়িতে গৃহপালিত পশুদের নাম লেখো। তারা যে খাদ্য খায় তার তালিকা করো।
- তিনটি উদ্ভিদের নাম লেখো যার পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড খাদ্য ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে চাল, ডাল, সবজি, চিনি, ডিম, মাংস, মাছ, ছানা, পায়েস, চিড়ে, মুড়ি, পেয়ারা, শসা, লঙ্কা, কাগজি, আতা, বাজরা, মাণ্ডুয়া, গুড়, ঘি, তেল ইত্যাদি পদার্থ ব্যবহার করি। যত প্রকার খাবার খাই তা আমাদের শরীরের বিভিন্ন আবশ্যকতা পূরণ করে কি? নানা প্রকার খাদ্য না খেয়ে শুধু ভাত বা রুটি খেলে কী অসুবিধা হবে? আমরা যে সব খাবার খাই তার আবশ্যকতা আমাদের দেহের জন্য রয়েছে। তোমার গ্রাম বা বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখো। ওদের মধ্যে কয়েকজন শিশুকে সুস্থ সবল দেখবে। তারা বিভিন্ন কাজে আগ্রহের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু ওদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখতে পাবে যারা পাতলা, দুর্বল তাদের আবার হাড়কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেণীকক্ষে তারা বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে, কয়েকজনের চুল দেখায় রুক্ষ। ওদর মধ্যে কয়েকজন ঘন ঘন ঠাণ্ডা, জ্বর, পায়খানা ইত্যাদি রোগে অসুস্থ হয়ে বিদ্যালয়ে অনেকদিন অনুপস্থিত থাকে। এর কারণ কী? সুস্থ শরীরের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য না খাওয়ায় তাদের এই অবস্থা। খাদ্য শরীর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কাজ করার শক্তি জোগায়। শরীরে রোগ প্রতিরোধক শক্তি সৃষ্টি করে। প্রত্যেক খাদ্য পদার্থের কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তাকে পোষক (Nutrient) বলা হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য পদার্থে এই পোষকের ভিতরে পার্থক্য থাকে। কাজেই সুস্থ থাকার জন্য আমাদের নানা রকমের খাবার খাওয়া প্রায়োজন। খাদ্যে থাকা মুখ্য পোষককে কেন্দ্র করে খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে।

সেগুলি হল শ্বেতসার, পুষ্টিসার, স্নেহসার, ভিটামিন বা জীবসার, খনিজ লবণ। শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য জল ও তন্তু জাতীয় খাদ্য নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য এত প্রকার খাবার দরকার আছে কি?

(ক) উদ্ভিজ্জ খাদ্য

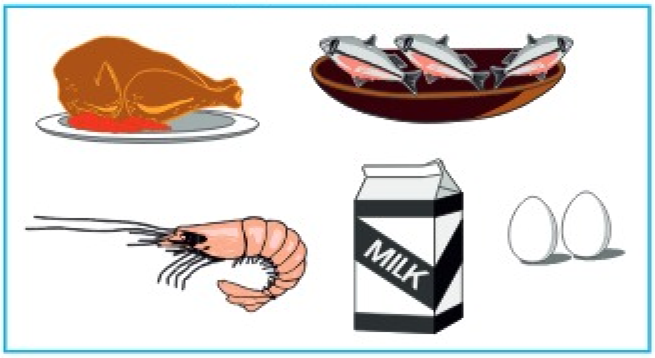

(খ) প্রাণীজ খাদ্য

চিত্র ২.১ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য

কোন্ খাবারে কোন্‌গুলি বেশি পরিমাণে থাকে, এসো এবার তা একটু জেনে নিই।

২.১ খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

তোমার কাজ: ১

(শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য চেনার প্রণালী।)

একটি কাচের গ্লাসে এক চামচ আটাতে ৩-৪ চামচ জল মিশিয়ে ভালোভাবে গুলে নাও। সেই জল জল আটাতে দু-তিন ফোঁটা তৈরি হওয়া আয়োডিন দ্রবণ মিশিয়ে দাও। একে চামচ দিয়ে ভালোভাবে ঘেঁটে দাও। দ্রবণের রঙে কী পরিবর্তন হল দেখো। দেখবে তা গাঢ় নীল রং হয়ে গেছে। কারণ আয়োডিন দ্রবণ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে গাঢ় নীল রং করে দেয়। ঠিক সেই ভাবে সেদ্ধ আলু, চিঁড়ে গুঁড়ো, সরষের তেল, ডাল গুঁড়ো, দুধ

আলাদা আলাদা গ্লাসে নিয়ে তাতে আয়োডিন দ্রবণ মেশাও। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গাঢ় নীল রং হল দেখো। নীচের সারণী ২.১টি পূরণ করো।

চিত্র ২.২ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরীক্ষা।

সারণীর ২.১ শ্বেতসার পর্যবেক্ষণ

গাঢ় নীল রং হল	গাঢ় নীল রং হয়নি
সেদ্ধ আলু	সরষের তেল

তাহলে দেখলে সব খাবারই কিন্তু এক ধরনের নয়। আলু, চিঁড়ে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, কিন্তু সরষের তেল, ডাল, দুধ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য নয়। তেমনি পরীক্ষা করলে তুমি জানতে পারবে চাল, আটা, মুড়ি, রাঙাআলু, চিনি, কচু, ওল, বাজরা, মাণ্ডুয়া ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য।

তোমার কাজ: ২

(পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য চেনার প্রণালী।)

একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকে বোতল নাও। ওই বোতলে অল্প গুঁড়ো ডাল ঢুকিয়ে দাও। ড্রপারের সাহায্যে ওর ভিতরে ৮-১০ বিন্দু জল দাও। এর পর এতে দু'ফোঁটা তুঁতে (কপার সালফেট) ও ৮-১০ ফোঁটা ক্ষার সোডার দ্রবণ মেশাও। বোতলে ছিপি লাগাও ও একে ভালোভাবে নাড়াও যাতে দ্রবণগুলি ভালোভাবে মিশে যায়। কিছুক্ষণ একটি জায়গায় স্থিরভাবে রেখে দাও। তারপর একে দেখো রঙে কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি না। দ্রবণটি বেগুনে রং হয়ে যাবে। ঠিক এভাবে পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্যগুলি পরীক্ষা করো। এবার দুধ, চটকানো বেগুন, ডিমের লালা ভাগ নিয়ে পরীক্ষা করো। কোন্ ক্ষেত্রে বেগুনি রং হচ্ছে নীচের সারণীতে লেখো।

সারণী ২.২ পুষ্টিসার পর্যবেক্ষণ

বেগুনি রং হল	বেগুনি রং হয়নি
ডালের গুঁড়ো	ভাত

ডাল, ডিমের সাদা লাল, দুধ, মাছ, সয়াবিন, ছাতু ইত্যাদি পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য:

তোমার কাজ: ৩

(স্নেহসার জাতীয় খাদ্য চেনার প্রণালী।)

কয়েক টুকরো সাদা কাগজ নাও। আটা, সিদ্ধ আলু, চিনাবাদাম গুঁড়ো, নারকেল কোরা, সরষে গুঁড়ো আলাদা আলাদা কাগজে ঘসে গুঁড়োগুলো কাগজের উপর থেকে ঝেড়ে কাগজটি রোদে কিছুক্ষণ শুকিয়ে নাও। লক্ষ করো, কোন্ কাগজটি তেলতেলে দেখা যাচ্ছে, তাতে রগড়ানো পদার্থে তেল আছে। যে কাগজ তেলতেলে হয়নি, ওই কাগজে রগড়ানো খাদ্য পদার্থে তেল নেই বা কম পরিমাণে রয়েছে। এই পরীক্ষা দ্বারা জানলে যে, চিনাবাদাম, সরষে, নারকেলে বেশি পরিমাণে তেল রয়েছে। কাজেই এগুলি স্নেহসার জাতীয় খাদ্য। তেমনি সূর্যমুখীর বীজ, তিল, অতসী, কুসুম, রেড়ি, মাছ ও মাংসের চর্বি, ডিমের কুসুম, গোরু ও মহিষ ঘি, মাখন ইত্যাদিতে স্নেহসার রয়েছে। যে স্নেহসার উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ্জ স্নেহসার ও যা প্রাণী থেকে পাওয়া যায় তা প্রাণীজ স্নেহসার।

খাদ্যে স্নেহসার, পুষ্টিসার ও শ্বেতসার থাকে বলে তুমি পরীক্ষা করে জানতে পারলে। এছাড়া ভিটামিন ও খনিজ লবণও বিভিন্ন খাদ্যে থাকে। এটাও আমাদের শরীরের জন্য একান্ত আবশ্যক।

আমরা জানলাম, খাদ্যের ভিতরে রয়েছে শ্বেতসার, পুষ্টিসার, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। প্রত্যেক খাদ্যে প্রায় সমস্ত প্রকার পোষক অল্প বা বেশি পরিমাণে থাকে। কিন্তু যে খাদ্যে পোষকটি বেশি পরিমাণে থাকে, তাকে আমরা সেই জাতীয় খাদ্য বলি। চালে শ্বেতসার বেশি পরিমাণে থাকায় তাকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বলা হয়। মাংসে অধিক পুষ্টিসার থাকায় তাকে পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য বলা হয়। চিনা বাদামে বেশি তেল থাকার জন্য তাকে স্নেহসার জাতীয় খাদ্য বলা হয়।

২.২ পোষক আম শরীরের জন্য প্রয়োজন।

খাদ্যের আবশ্যকতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। খাদ্যের মধ্যে থাকা বিভিন্ন পোশকের কার্যে প্রভেদ থাকে। সেগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়। পোষকগুলি আমাদের শরীরের নানারকম আবশ্যকতা পূরণ করে বলে সেগুলির অভাবে অনেক রোগ হয়।

শ্বেতসারের চেয়ে স্নেহসার বেশি শক্তি জোগায়। কিন্তু স্নেহসার জাতীয় খাদ্য সহজে হজম হয় না।

শ্বেতসার, স্নেহসার ও পুষ্টিসারের অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দেয়। রোগের কারণ ও লক্ষণ দেখে রোগের নামকরণ হয়। যথা—শ্বেতসারের অভাবে মারাসমস ও পুষ্টিসারের অভাবে কোয়াসিওকর। মারাসমস রোগের লক্ষণ হল—পাতলা পায়খানা হওয়া, বৃদ্ধি না হওয়া, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়া, মাথার চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তেমনি কোয়াসিওকর আক্রান্ত রোগীর হাত, পা, মুখ ফুলে যায় ও মাথার চুল উঠে যায়। সাধারণত শিশুদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

সারণীর ২.৩ পোষক তাদের উৎস ও কার্য

পোষক	উৎস	কার্য
শ্বেতসার	চাল, চিনি, গুড়, আলু, মাড়ুয়া, ভুট্টা, কচু, বাজরা, আটা, রাঙাআলু ইত্যাদি।	• কাজ করার জন্য শরীরে শক্তি জোগায়। • অতিরিক্ত স্নেহসার শরীরে চর্বি আকারে জমা থাকে, প্রয়োজনের সময় তা থেকে শক্তি পাওয়া যায়।
পুষ্টিসার	ডাল, ঘি, মাখন, মাছ, দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।	• শিশুদের শরীর পুষ্টিতে সাহায্য করে। • অকেজো কোষের পরিবর্তে নতুন কোষ সৃষ্টি করে।
স্নেহসার	তেল, ঘি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।	• কাজ করার শক্তি জোগায়। • চামড়া মসৃণ রাখে।

এই সারণীকে অনুধ্যান করে আলোচনা কর।

খাদ্যে যে ভিটামিন থাকে শরীরের পক্ষে তা বিশেষ উপকারী। তা আমাদের চোখ, দাঁত, অস্থিকে সুস্থ রাখে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রোধ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। গর্ভবতী মহিলা, শিশু, বয়স্ক লোকের মধ্যে এই ভিটামিনের অভাব দেখা যায়। সেজন্য ডাক্তার তাদের এই ভিটামিন খেতে পরামর্শ দেন।

সারণী ২.৪ ভিটামিন, সেগুলি কোথায় পাওয়া যায়, সেগুলির অভাবে কী রোগ হয় ও তার লক্ষণ

ভিটামিন	কোথায় পাওয়া যায়	এর অভাবে কী রোগ হয় ও আর লক্ষণ
'A'	পাকা পেঁপে, পাকা আম, গাজর, দুধ, মাছের তেল	• রাতকানা রোগ, অনেক সময় দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি লোপ পায়। চামড়া খসখসে হয়, ব্রণ বেরোয়।
'B	ঢেঁকিকোটা চাল, গমের ভুসি মেশা আটা, শাক, অম্লব্যঞ্জন, ছাগলের মেটে, দুধ	• বেরিবেরি রোগ হয়। • গালে মুখে ঘা। • হাত পা ফুলে যাওয়া, ঝিমঝিম করা, পায়ের তলায় ছুঁচ ফোটার মতো যন্ত্রণা হওয়া।
'C'	কমলালেবু, কাগজি, পেয়ারা, টম্যাটো, আমলকী, কাঁচালঙ্কা, টাটকা সবজি।	• স্কর্ভি রোগ হয় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, ঘা তাড়াতাড়ি ভালো হয় না ।
'D'	ছোটো মাছ, মেটে (ছাগল), ডিম, কড লিভার তৈল, দুধ, সূর্যকিরণ (সোজাসুজি সূর্যকিরণ থেকে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায় না। আমাদের চামড়ার উপরে সকালের সূর্যকিরণ পড়লে ভিটামিন 'ডি' তৈরি হয়। সেজন্য শিশুকে সকালের সূর্যকিরণে কিছু সময় শুইয়ে রাখা দরকার।	• রিকেটস, অস্টিওমালোসিয়া রোগ হয়, হাত পা সরু হয়ে যায়, অস্থি মজবুত হয় না।
'E'	গজা মুগ, গজা বুট, তিল তৈল, সূর্যমুখী তেল, ফল	• চামড়া মসৃণ হয় না কারণ স্নেহসার শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। • স্ত্রীলোকেদের বন্ধ্যা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
'K'	বিভিন্ন রকমের শাক, মাছ, দুধ, মাংস, তাজা সবজি, ফল, বাঁধাকপি।	• শরীরের কাটাস্থান থেকে রক্ত বেরোনো বন্ধ হয় না।

ভিটামিনের অভাবে আমরা নানা রোগে আক্রান্ত হই। সারণী ২.৪-এ কিছু ভিটামিনের কার্য ও তা কোন্ খাবার থেকে পাওয়া যায় দেওয়া হয়েছে। এসো সে বিষয়ে আলোচনা করি। ইহা ব্যতীত ভিটামিন 'বি', 'বি$_২$' ও 'বি$_{১২}$' ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে ভিটামিন 'বি$_{১২}$' আবশ্যকতা খুব বেশি। ইহা সাধারণত মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মেটে ইত্যাদিতে থাকে। ইহা রক্তের শোণিত কোষ তৈরিতে সাহায্য করে। স্নায়ু সতেজ রাখার জন্য 'বি$_{১২}$' দরকার।

ভিটামিনের মধ্যে কিছু আবার জলে মিশে যায়। যথা: ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি। এজন্য সবজি কেটে অনেক সময় ধরে জলে ভিজিয়ে রাখলে ও বেশি সেদ্ধ করলে কাঁচা সবজির ভিটামিন জলে দ্রবীভূত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অন্য কিছু ভিটামিন যেমন এ, ডি, ই ও কে জলে মেশে না। সেগুলি স্নেহসার দ্রবণে মিলিয়ে যায়। কাজেই সবজি কাটার আগে ধোয়া উচিত।

খাদ্যের অন্য এক পোষক লবণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইহা আমাদের শরীরের জন্য অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এর উপাদেয়তা বেশি। আমরা ডাল, তরকারি, চচ্চড়িতে নুন দিই। এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। ইহা একপ্রকার লবণ। শরীরের জন্য আরও কয়েকটি লবণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তুমি বাড়িতে দেখেছ কাঁচকলা কেটে জলে রাখলে খানিকক্ষণ পরে সেই জলের রং বদলে যায়। এমন কেন হয়? কলায় থাকা খনিজ লবণ জলে মিশে যাওয়ার ফলে জলের রং বদলে যায়। এর থেকে জানা যায়, খাদ্য পদার্থে খনিজ লবণ মিশে থাকে। এটা আমাদের শরীর-দেহের জন্য অনেক উপকারী। এর অভাব ঘটলে অচিরেই শরীরের অবক্ষয় দেখা দেয়। উপরোক্ত ২.৫-এ সে সম্পর্কে সূচনা দেওয়া হয়েছে।

সারণী ২.৫ বিভিন্ন খনিজ লবণ, তাদের উৎস, কার্য ও অভাবজনিত রোগ

খনিজ লবণ	কোথায় পাওয়া যায়	উপকারিতা	অভাবজনিত রোগ
ক্যালশিয়ামযুক্ত লবণ	ছোট মাছ, মাছের কাঁটা, দুধ, মাংস, শাক।	দাঁত ও অস্থি গঠনে সাহায্য করে।	অস্থি বেঁকে যায়।
লৌহযুক্ত লবণ	সজনে শাক, পুঁই, ঢেঁড়স, কলা, মাডুয়া, পালং ইত্যাদি।	রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।	রক্তহীনতা দেখা যায়।
আয়োডিনযুক্ত লবণ	সজনে ডাঁটা, সমুদ্রের মাছ, সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলের শাকসবজি, ফল, আয়োডিনযুক্ত নুন।	থাইয়ের এড্ গ্রন্থি কর্মক্ষম করে।	গলগণ্ড রোগ হয়। শিশুর মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন পোষক থাকা আবশ্যকীয়, খাদ্যের পরিমাণ তার বয়স, লিঙ্গ, তথা সে কী কাজ করে তার উপরে নির্ভর করে। ছোট শিশুর জন্য যে খাদ্য আবশ্যক তা তোমার জন্য উপযুক্ত না হতেও পারে। তেমনি যুবকের উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য একজন বৃদ্ধের খাদ্য থেকে পৃথক। পুরুষমানুষের আবশ্যকতা স্ত্রীলোকের চেয়ে আলাদা। কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করা মানুষের খাদ্যে আবশ্যকতা ছাত্র কিংবা অফিসে কাজ করা লোকের খাদ্য থেকে পৃথক। কাজেই উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যকীয় খাদ্যতালিকা করা যেতে পারে। শরীরের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণের খাদ্য পদার্থ নিয়ে সুষম খাদ্যের তালিকা করা হয়। তোমার বয়সে ছেলেকে কোন্ জাতীয় খাবার কী পরিমাণে প্রতিদিন খেলে শরীর বাড়বে, শরীর সুস্থ থাকবে,

খোসাযুক্ত কাঁচাফল ও বীজ, খোসাযুক্ত কাঁচাসবজি যথা: টম্যাটো, মূলা, গাজর, বীট, শসা, চাকিপেষা আটা, খোসাযুক্ত ডাল ও সকল প্রকার শাকে তন্তু থাকে। আটা ও ময়দার মধ্যে কোন্‌টিতে বেশি তন্তু থাকে বলো। অধিক তন্তুজাতীয় পদার্থ থাকায় আমাদের দৈনিক খাদ্যতালিকায় কিছু কাঁচাফল রাখা আবশ্যক। তোমার প্রত্যেক দিন স্যালাড খাওয়া উচিত।

২.৪ সুষম খাদ্য

আমরা জানলাম প্রত্যেক খাদ্যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা একই প্রকার খাবার না খেয়ে নানা রকম খাবার মিশিয়ে খেলে আমাদের শরীর আবশ্যক পোষক পাবে, নাহলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। একজন মানুষের জন্য

বিভিন্ন পোষক থাকা আবশ্যকীয়, খাদ্যের পরিমাণ তার বয়স, লিঙ্গ, তথা সে কী কাজ করে তার উপরে নির্ভর করে। ছোট শিশুর জন্য যে খাদ্য আবশ্যক তা তোমার জন্য উপযুক্ত না হতেও পারে। তেমনি যুবকের উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য একজন বৃদ্ধের খাদ্য থেকে পৃথক। পুরুষমানুষের আবশ্যকতা স্ত্রীলোকের চেয়ে আলাদা। কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করা মানুষের খাদ্যে আবশ্যকতা ছাত্র কিংবা অফিসে কাজ করা লোকের খাদ্য থেকে পৃথক। কাজেই উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যকীয় খাদ্যতালিকা করা যেতে পারে। শরীরের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণের খাদ্য পদার্থ নিয়ে সুষম খাদ্যের তালিকা করা হয়।

তোমার বয়সে ছেলেকে কোন্ জাতীয় খাবার কী পরিমাণে প্রতিদিন খেলে শরীর বাড়বে, শরীর সুস্থ থাকবে, লেখাপড়ায় মন বসবে, তা নীচের তালিকাতে দেওয়া হয়েছে। তা দেখো ও চিন্তা করো। তুমি দৈনিক যে খাবার খাও তার সঙ্গে তুলনা করে দেখো, তুমি পুষ্টিকর খাদ্য খাচ্ছ কি না।

নরামিষ আহারীদের দৈনিক চিনাবাদাম খাওয়া উচিত। তোমরা কাজু বা পেস্তা বাদাম খেও। শরীরের জন্য এটা প্রয়োজন।

খাবার খাওয়ার পরে কিন্তু দৈনিক ৮-১০ গ্লাস জল খাওয়া দরকার।

সারণী ২.৬: ১০-১২ বছরের শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যতালিকা

খাদ্য	নিরামিষ ভোজনের ক্ষেত্রে দ্রব্য পরিমাণ	আমিষ ভোজনের ক্ষেত্রে দ্রব্য পরিমাণ
শস্য (চাল, মকা, মাড়ুয়া, আটা)	৩২০ গ্রাম	৩২০ গ্রাম
ডাল (অড়হর, মুগ, বুট, মুসুর, রাজমা)	৭০ গ্রাম	৬০ গ্রাম
শাক ও কাঁচা সবজি	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
তরিতরকারি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
ফল (আপেল, পেয়ারা, আমলকী)	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
দুধ	৩০০ মি.লি	২০০ মি.লি
তল, ঘি	৩৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম
মাছ, মাংস, ডিম		৫০ গ্রাম
চিনি, মিষ্টি, গুড়	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম

কী শিখলাম:

- খাদ্যের মধ্যে থাকা পোষককে আধার করে খাদ্যকে শ্বেতসার, পুষ্টিসার, স্নেহসার, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।
- আমাদের খাদ্যে সকল জাতীয় পোষক নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক।
- শ্বেতসার, পুষ্টিসার, স্নেহসার, ভিটামিন আবশ্যক মতো না খেলে এর অভাবে অসুখ হতে পারে।
- পরিমিত খাদ্য আমদের সমস্ত পোষক সরবরাহ করে।
- প্রতিদিন পরিমিত আহারের তালিকায় তন্তুযুক্ত খাদ্য থাকা দরকার। এর সঙ্গে প্রয়োজনমতো জল খাওয়া দরকার।
- আমাদের খাদ্যে অনেকদিন ধরে কোনোরকম পোষকের অভাব ঘটলে আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে ও আমরা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

অভ্যাস

১. উল্লিখিত খাদ্যতালিকা থেকে কোন্‌টি কোন্ জাতীয় খাদ্য তা বেছে সংযুক্ত কুঠরিতে লেখো।

কুল, ঘি, ছোটমাছ, আমলকী, কাঁকরোল, শুঁটকি মাছ, শাক, বড়মাছ, ডিম, মাড়ুয়া, ছাতু, চিনাবাদাম, মুড়ি, নারকেল, সমুদ্রের মাছ, পেয়ারা, কমলা, পালংশাক, গাজর, পাকা আম, মুলো, আটা।

শ্বেতসার	পুষ্টিসার	স্নেহসার	ভিটামিন	খনিজ লবণ

২. কোন্‌গুলি ঠিক তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখাও।

(ক) সূর্যকিরণে ভিটামিন 'বি' থাকে।

(খ) আমলকীতে ভিটামিন 'সি' থাকে।

(গ) শুঁটকি মাছে বেশি স্নেহসার থাকে।

(ঘ) পুষ্টিকর খাদ্য শরীরের আবশ্যকতা পূরণ করে।

(ঙ) 'রক্তাল্পতা' হলে সমুদ্রের মাছ খাওয়া উচিত।

(চ) ভিটামিন 'কে' সজনে ডাঁটাতে পাওয়া যায় না।

(ছ) রাতকানা লোকের গাজর খাওয়া অনুচিত।

(জ) দুধে সবরকমের ভিটামিন থাকে।

৩. **দু'টি বা তিনটি বাক্যে কারণ লেখো।**

(ক) আহারে তন্তুযুক্ত খাবার থাকা আবশ্যক।

(খ) আমিষ না খাওয়া শিশুর বেশি পরিমাণে দুধ, ডাল, বাদাম খাওয়া দরকার।

(গ) রামধনু অন্ধকারে দেখা যায় না।

(ঘ) শিশুদের পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্যে আবশ্যকতা বেশি।

(ঙ) পাহাড়িয়া অঞ্চলের লোকদের গলগণ্ড অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৪. নীচে দেওয়া প্রত্যেক পোষকের জন্য দু'টি খাদ্য পদার্থের নাম লেখো।

(ক) পুষ্টিসার ——, ——

(খ) ভিটামিন 'সি' ——, ——

(গ) খনিজ লবণ ——, ——

৫. শাকে কোন্‌টি থাকে না?

(ক) খনিজ লবণ (খ) তন্তু (গ) ভিটামিন (ঘ) স্নেহসার

৬. যদি সব গরু ও মহিষ লোপ পায় তবে দুধ, দই, ঘি, ছানা ব্যতীত আর যেসব খাদ্য পদার্থ পাওয়া যাবে না তার মধ্যে দুটোর নাম লেখো।

৭. একটি বর্ধিষ্ণু শিশু ও একজন বৃদ্ধের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যে পার্থক্য তা যুক্তিসহ সংক্ষেপে লেখো।

বাড়িতে বসে করো:

- তোমার অঞ্চলে যেসব খাদ্য পাওয়া যায় সেগুলোর উপর নির্ভর করে তোমার উপযোগী খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করো।
- তোমার অঞ্চলে পাওয়া খাদ্য থেকে উপযোগী পদার্থ ব্যবহার করে ছাতুর প্রস্তুত প্রণালী লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্য পদার্থের পরিষ্করণ

তুমি কাঁকর মেশানো চাল দেখেছ। গোলমরিচের সঙ্গে পেঁপের বীজ মিশে থাকে। দোকান থেকে থলিতে সওদা আনার সময় কখনও-কখনও চালে ডাল মিশে যায়। এগুলি না বাছলে খাওয়া যায় কি? ভাতে কাঁকর থাকলে তুমি কী করো? বাড়িতে রান্না করার আগে চাল থেকে কাঁকর কীভাবে বাছা হয়? কিছু খাদ্য পদার্থ মিশে গেলে বা খাদ্য পদার্থে অন্যান্য পদার্থ মিশে গেলে একে আলাদা করে খাদ্য পদার্থ পরিষ্কার করা দরকার।

আমরা এখন খাদ্য পদার্থ কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে আলাদা করা সম্ভব তা আলোচনা করব।

পৃথক করার প্রণালী

৩.১ হাতে করে বাছা (Hand Picking)

চিত্র: ৩.১ হাতে বাছার পদ্ধতি

তোমার কাজ: ১

বাড়ি থেকে দু'মুঠো চাল নিয়ে এসো। স্কুলের টেবিলের উপরে কিংবা লম্বা মেঝেতে একটি সাদা কাগজ বিছিয়ে দাও। কাগজের উপরে চাল বিছিয়ে দাও। চালের সঙ্গে কী মিশে আছে তা দেখো ও তোমার খাতায় তালিকা করো। এই চালে কাঁকর, বালি, কুড়ো, ধুলো, মরা (কালো) চাল, ধান, কাঠি ইত্যাদি থাকতে পারে।

এগুলির মধ্যে কোন্গুলি তুমি হাতে করে বেছে চাল থেকে বের করতে পারবে? তুমি নিশ্চয় বড় কাঁকর, কাঠি ও মরা চাল বের করতে পারবে। এক হাতে বাছার পদ্ধতিকে (Hand Picking) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে আঙুল দিয়ে ধরা জিনিসকে পৃথক করা যায়। অন্য কী কী পদার্থ পরিষ্কার করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় আলোচনা করে তার তালিকা করো।

৩.২ চালানো (Sieving)

চিত্র: ৩.২ চালানো প্রণালী

এর আগে তুমি চাল থেকে কাঁকর ও মরা চাল, কাঠি হাতে বেছে বের করে দিয়েছ। চালে ধুলো, সরু বালি ও কুটা মিশে থাকতে পারে। এই ধুলো, সরু বালি ও কুটা ইত্যাদি চাল থেকে কীভাবে আলাদা করবে? তুমি বাড়িতে চালুনি দেখেছ! চালুনিতে ছোট ছোট ফুটো থাকে। এতে চাল চালিয়ে দিলে চাল থেকে সরু বালি, ধুলো, কুটা ও ভাঙা চাল (খুদ) ইত্যাদি চালুনির ফুটো দিয়ে নীচে পড়ে যাবে। চালুনিতে পরিষ্কার চাল রয়ে যাবে। চালুনির সাহায্যে পরিষ্কার করা এক প্রণালী। একে চালানো বলা হয়। এই প্রণালীতে আটা থেকে কুড়ো আলাদা করা যায়। চালুনির সাহায্যে আর কোন্ কোন্ খাদ্য পদার্থ পরিষ্কার করা যায়, তার এক তালিকা করো।

ভিন্ন ভিন্ন চালুনির ফুটোর আকার ছোটো বড় হয়। এর কারণ কী আলোচনা করো।

৩.৩ পাছড়ানো ও উড়ানো (Winnowing)

চিত্র: ৩.৩ কুলোতে পাছড়ানো প্রণালী

চিত্র: ৩.৪ উড়ানো প্রণালী

চালে বড় বড় কুটা উড়ানো প্রণালী ও কিছু কাঠির টুকরো থাকতে পারে। এগুলি কী করে চাল থেকে বেছে আলাদা করবে? বাড়িতে কুলোর সাহায্যে খাওয়ার জিনিস পাছড়াতে দেখেছ। এই প্রণালীতে হালকা পদার্থ ভারী পদার্থ থেকে আলাদা করা হয়ে যায়। চাল পাছড়ালে এতে থাকা তুঁষ ও হালকা কাঠি আলাদা হয়ে যায়। একে পাছড়ানো প্রণালী বলে। অন্য এক উপায়ে কুলোতে চাল নিয়ে উপর থেকে নীচে ধীরে ধীরে ঢাললে হাওয়ায় হালকা খোসা, কাঠি পাতা চাল থেকে উড়ে যায়। একে উড়ানো প্রণালী বলে। এই দুটি উপায়ে ধান থেকে তুঁষ, কাঠি ও পাতা আলাদা করা যায়। বিউরি, মুগ ইত্যাদি শস্য পাছড়ে বা উড়িয়ে পরিষ্কার করা যায়। আজকাল বিদ্যুৎ পাখার সাহায্যে উড়ানো হচ্ছে। আর কী কী খাদ্য পদার্থ পরিষ্কার করার জন্য এই প্রণালী ব্যবহার করা হয় আলোচনা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

৩.৪ আস্রবণ ও অবক্ষেপণ (Decantation and Sedimentation)

চিত্র: ৩.৫ আস্রবণ প্রণালী

একটি পাত্রে কিছু চাল নাও। সেই পাত্রে জল ঢালো। ভালোভাবে তা ঘাঁটাঘাঁটি করে দাও। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রেখে দিলে কী দেখতে পাবে? জলে হালকা খোসা, কাঠি, ধুলো সব ভাসছে। পাত্রের তলায় কাঁকর, বালি ও চাল বসে গেছে। আস্তে আস্তে উপরের জলটুকু অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নাও। জলের সঙ্গে ধুলো, খোসা ও কাঠি চলে যাবে। জলের সঙ্গে হালকা কঠিন পদার্থকে অন্য এক পাত্রে ঢালবার প্রণালীকে আস্রবণ বলা হয়। নীচে কঠিন, ভারি পদার্থ বসে যাওয়া প্রণালীকে অবক্ষেপণ বলা হয়।

সরষে, জিরা, মেথি ইত্যাদি কীভাবে পরিষ্কার করা হয়, আলোচনা করে লেখো।

৩.৫ পরিস্রাবণ প্রণালী (Filtration)

চিত্র: ৩.৬ পরিস্রাবণ

বর্ষাকালে বন্যার সময় নদীর জল ঘোলা হয়। পুকুরের জলও ঘোলা হয়ে যায়। এর কারণ কী? জলে মাটি, বালি, ধুলো মিশে গেলে জল ঘোলা হয়ে যায়। এই ঘোলা জলকে পরিষ্কার করতে পারবে কি? একটি কাচের

গ্লাসে তার অর্ধেক পর্যন্ত ঘোলা জল ঢালো। তার পরে একে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া না করে একটি জায়গায় রেখে দাও। তুমি কী দেখবে? জলে কী ভাসছে? গ্লাসের নীচের দিকে কী জমে আছে? হালকা কাঠি, কুটা ও ধূলিকণা ভাসছে। ভারি বালি, কাঁকর ও মাটি জলের তলায় জমে গেছে, এই জমে থাকাকে অবক্ষেপণ বলা হয়। এ বিষয়ে তুমি আগেই জেনেছ। এবার উপর অংশের জল অন্য একটি গ্লাসে আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। একে স্রবণ পদ্ধতি বলা হয়। ঢেলে নেওয়া গ্লাসের জলে আর কী কী রয়েছে? এই জল ময়লা দেখা যায়। কারণ এতে মাটি ও কাঠির টুকরো রয়েছে। জল থেকে এই মাটি কণা ও কাঠিপত্র কীভাবে আলাদা করবে?

একটি প্লাস্টিক বোতল নাও। এর খোলা মুখে উপযুক্ত আকারের ফানেল লাগাও। ওই ফানেলের ভিতরে একটা ফিলটার পেপার ভাঁজ করে রাখো। দ্বিতীয় গ্লাসে সংগৃহীত জল ফানেলের ভিতরের ফিলটার পেপারের উপরে আস্তে আস্তে ঢালো। বোতলের ভিতরে যে জল পড়ছে তা পরিষ্কার মনে হচ্ছে কি? এই প্রণালীকে পরিস্রাবণ বলা হয়। এই প্রণালীর মাধ্যমে তরল পদার্থে থাকা অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ থেকে পৃথক করা যায়।

পরিস্রাবণ পদ্ধতি কী? আলোচনা করে লেখো।

চিত্র :৩.৭ ধান মাড়াই

৩.৬ শস্য আদায় করা (Harvesting)

জমিতে ধান মাড়াই করতে দেখেছ কি? জমি থেকে ধান কেটে আনার পরে আঁটি বেঁধে এক জায়গায় গাদা করে রাখা হয়। কোথাও কোথাও ধানের ডগাগুলি কেটে আনা হয়। খড়ে ধান থাকলে বাঁশের মাচা বেঁধে তার সাহায্যে ঝাড়া হয়। ধান কাটা হয়ে গেলে খামারে এনে ধানের আঁটি বলদের সাহায্যে মাড়াই করা হয়। মুগ, বিরি ইত্যাদি শস্যও মাড়া হয়।

চিত্র : ৩.৮ ধান মাড়াই

অন্য আর কোন্ শস্য পিটিয়ে বা মাড়াই করে শিষ থেকে ঝাড়া হয়।

কী শিখলাম:

- খাদ্যশস্য থেকে কাঁকর, নুড়ি, কাঠি ও কুটা ইত্যাদি হাত দিয়ে বেছে পৃথক করা যায়।
- কুঁড়ো, পাত্র, খোসা ইত্যাদি হালকা পদার্থ পাছড়ানো পদ্ধতিকে ভারি পদার্থ থেকে আলাদা করা যায়।
- বড় ও ছোট আকারের দু'টি কঠিন পদার্থ চালুনিতে চেলে আলাদা করা যায়।
- জলের ভিতরের অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে পৃথক করা যায়।
- জলে অদ্রবণীয় ভারি ওজনের পদার্থকে অপক্ষেপণ ও হালকা পদার্থতে আস্রাবণ পদ্ধতিকে পৃথক করা যায়।

অভ্যাস

১. **কীভাবে পৃথক ও পরিষ্কার করবে ?**

(ক) অড়হর ডালে সুজি মিশে গেলে

(খ) চালে ভুসি থাকলে

(গ) গমে ভুসি থাকলে

(ঘ) খইতে ধানের খোসা লেগে থাকলে

(ঙ) গোলমরিচের সঙ্গে পাকা পেঁপের বীজ মিশে থাকলে

২. **পার্থক্য লেখো।**

(ক) পাছড়ানো ও উড়ানো

(খ) ধান পিটা ও ধান মাড়া

(গ) অবক্ষেপণ ও পরিস্রাবণ

৩. **কোন্ প্রণালীর জন্য প্রয়োজন**

(ক) কুলা (খ) চালুনি (গ) ফিলটার পেপার

৪. **কারণ কী ?**

(ক) ভুসি মেশা চাল পাছড়ে পরিষ্কার করা হয়।

(খ) রান্নার আগে চাল ভালোভাবে ধোয়া হয়।

(গ) ব্যসন ও ময়দার মিশ্রণ চালুনি দিয়ে চেলে আলাদা করা যায় না।

(ঘ) সরষেকে পরিস্রাবণ প্রণালীতে পরিষ্কার করা যায় না।

৫. **ভেবে বলো তো ?**

গোটা বিউরি, সরষে ও ছোলা মিশে গেলে কীভাবে আলাদা করবে ?

বাড়িতে বসে করো:

- একটি প্লাস্টিক বোতলে কয়লা, সরু বালি, মোটা বালি, তুলা ইত্যাদি সহযোগে একটি জলছাঁকার যন্ত্র তৈরি করো।

চতুর্থ অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বস্তু

পোশাকের জন্য ব্যবহৃত বস্তু।

তোমরা প্যান্ট, শার্ট বা ফ্রক পরছ। সকলেই কি একই রকম কাপড়ের তৈরি প্যান্ট, শার্ট বা ফ্রক পরছ। বলো তো তোমার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী কী পরে স্কুলে আসেন? এসব যা পরা হয় তাই আমাদের পোশাক বা বস্ত্র।

তুমি পূজা পার্বণে নানা প্রকার পোশাক পরো। শীতের সময় তুমি গরম পোশাক যথা—সোয়েটার, মাফলার, টুপি, পশমের চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করো। গরমের সময় সুতির কাপড় পরতে ভালো লাগে। বর্ষাকালে তোমার পরিবারের সকলে কী কী পোশাক পরে তার একটা তালিকা করো।

৪.১ পোশাক তৈরির জন্য ব্যবহৃত বস্তু

তুমি নানারকম বস্ত্র বা পোশাকের তালিকা করেছ। তুমি বলো তো এসব বস্ত্র বা পোশাক একরকম কাপড়েই হয়েছে? বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো ও বাড়িতে মা বাবার কাছে জেনে নাও যে, ব্যবহার করা শাড়ি, চাদর ও অন্যান্য জামাকাপড় কীভাবে তৈরি হয়েছে। এই সব পোশাকের একটি তালিকা করো।

৪.১ নানারকম পোশাক

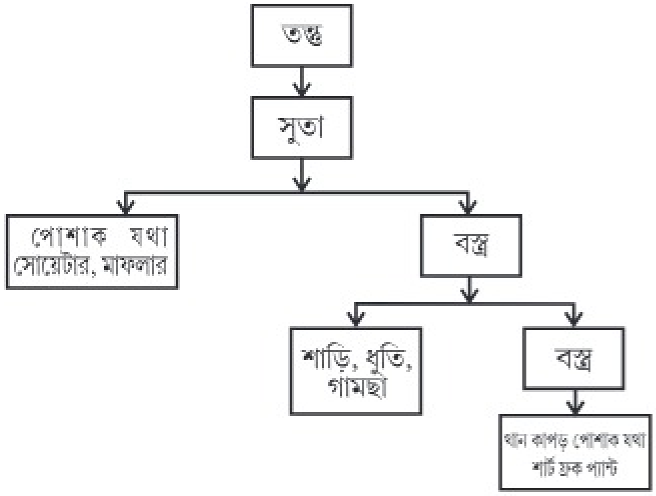

তোমার কাজ: ১

দর্জির দোকান থেকে একটু একটু অদরকারী কাপড় নিয়ে এসো। প্রত্যেক কাপড় থেকে একটি করে সুতো বের করো। ওকে ভালো করে দেখো। সবই কি একই ধরনের পদার্থে তৈরি। সুতো খোলার চেষ্টা করো। বলো তো সুতো কীভাবে তৈরি হয়? তুলো থেকে সুতো তৈরি হয়। এবার জানলে তো তুলো থেকে সুতো হয় তারপর সুতো বুনে কাপড় তৈরি হয়।

৪.২ তন্তুর প্রকারভেদ

আগের তৈরি করা তোমার কাজ লক্ষ করো। সব সুতো কি একরকমের তুলা থেকে তৈরি। শীতের সময় ব্যবহার করা সোয়েটার যে সুতোয় তৈরি তোমার বিদ্যালয়ে পরে আসা প্যান্ট সেই সুতোতে কি তৈরি? পলিস্টারের কাপড়, সুতির কাপড়, রেশম কাপড় একরকম তন্তু থেকে তৈরি হয় না। গুটি পোকা থেকে রেশম সুতো বেরোয়। রেশম বস্ত্র তৈরি করতে এই রেশমজাত সুতো ব্যবহার করা হয়।

শীতের সময় তুমি যে গরম কাপড় পরো তা পশম থেকে তৈরি হয় ও এ থেকে সোয়েটার, মাফলার, চাদর ইত্যাদি তৈরি হয়। এই পশম প্রধানত

ভেড়ার লোম থেকে তৈরি হয়। সেই উল বা পশম চামরিগাই ও ছাগলের লোম থেকে পাওয়া যায়। তুলা, পাঠ, রেশম, পশম এক একটি তন্তু। সাধারণত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে এগুলো পাওয়া যায়।

তুমি এক ধরনের কাপড় দেখেছ যার সুতো প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় না। নাইলন, পলিস্টার, টেরিলিন কাপড় তুমি ব্যবহার করেছ। খনিজ তৈল থেকে তৈরি করা সুতো দিয়ে ওই কাপড় হয়। বড় বড় কারখানায় ওইসব সিন্থেটিক কাপড় হয়। এগুলো খুব শক্ত ও মজবুত হয়, সহজে ছেঁড়ে না। কিন্তু এই কাজে রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকার দরুন চর্মরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তার এ ধরনের কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।

৪.৩ কয়েকটি উদ্ভিদজাত তন্তু

কাপাস (Cotton)

চিত্র: ৪.৩ কাপাস গাছ

তুমি কার্পাস গাছ দেখেছ? কার্পাস গাছের ফল পেকে গেলে ফেটে যায়। সেই ফল থেকে তুলা বের করা হয়। তুলা এক উদ্ভিদজাত তন্তু। কিছু তুলা নিয়ে এসো। একে হাতে ছিঁড়ে দেখো। কী কী কাজে কার্পাস তুলা ব্যবহার করা হয় তার একটা তালিকা তৈরি করো।

তুলা থেকে সুতা হয়। তুলা ধুনবার (ধুনচি) ধনুরাকৃতি যন্ত্র দিয়ে তুলা ধুনতে হয়। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে তুলা ধুনে তুলা থেকে বিচি ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

কার্পাস চাষের জন্য কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা ও উষ্ণপ্রধান জলবায়ু উপযুক্ত। এই মৃত্তিকার জলধারণ শক্তি বেশি। মাটি শুকিয়ে গেলে ফেটে যায়, ফলে বাতাস সহজে ভেতরে ঢুকতে পারে ও ছোট ছোট জীবেরা জীবিত থাকতে পারে। আমাদের দেশে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বেশি কার্পাস চাষ হয়। সেজন্য আমরা মুম্বই, সুরাট, আহমেদাবাদে অনেক কাপড়ের কল দেখতে পাই। ওড়িশায় কোন্ অঞ্চলে এখন কার্পাস চাষ হয় তোমরা কি জানো?

তোমার বাগানে শিমুল গাছ থাকলে দেখবে শিমুল গাছ কার্পাস গাছ থেকে অনেক বড়। এর ফল পেকে শুকিয়ে যাওয়ার পর ফেটে যায় ও তা থেকে তুলা বেরিয়ে পড়ে বাতাসে উড়তে থাকে। তোমার গ্রামে শিমুল গাছ থাকলে, গরম দিনে তা দেখে নিও। শিমুল তুলো কী কী কাজে লাগে আলোচনা করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

শিমুল তুলো

পাট (Jute)

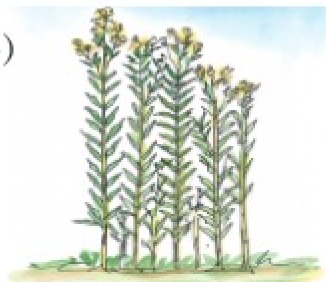

চিত্র: ৪.৪ নলিতা বা পাট গাছ

ধান, চাল ইত্যাদি রাখার জন্য বস্তা ব্যবহার করা হয় তুমি জানো। সে বস্তা কীভাবে তৈরি হয়? শণ খুব শক্ত আঁশ। শণ থেকে সেগুলো তৈরি আজকাল চটের বস্তার সঙ্গে প্লাস্টিকের বস্তাও ব্যবহার করা হচ্ছে। শণ হল উদ্ভিতজাত তন্তু। তোমাদের মধ্যে যারা গ্রামে বাস করো তাদের মধ্যে কেউ কেউ লম্বা লম্বা সরু গাছ লাগাতে দেখেছ নিশ্চয়। জানো কি সেগুলো কী গাছ? এদের বলা হয় নলিকা গাছ।

গ্রামে ও শহরেও দেওয়ালিতে পাটকাঠি জ্বেলে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা হয়। এগুলি পাটগাছের কাঠি। এর বাইরের আবরণ সরিয়ে শণ প্রস্তুত করা হয়। এই গাছ থেকে শণ কীভাবে প্রস্তুত হয় জানো কি? পাট গাছ কেটে বিড়া বাঁধা হয়। ওই বিড়াগুলি পুকুরের জলে প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়। বিড়াগুলি পচে যাওয়ার পরে তাকে ঝেড়ে শণ বের করে রোদে শুকিয়ে রাখা হয়।

বর্ষাকালে পলিমাটিতে ভালো পাট চাষ হয়। আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গে বেশি পাটচাষ হয়। ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়া জেলায় ভাল পাট চাষ হয়। শণ থেকে কী কী তৈরি হয়, তার একটি তালিকা করো।

নারকেল

নারকেলগাছ

তোমার গ্রামে নারকেল গাছ আছে কি? নারকেল ছাড়ানোর পর যে ছোবড়া বেরোয় তাকে বলা হয় নারকেল গাছের তন্তু। এই ছোবড়া দিয়ে দড়ি, পাপোশ, গদি ইত্যাদি তৈরি হয়। এই নারকেল ছোবড়া দিয়ে আর কী তৈরি হয়, তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

৪.৪ তন্তু থেকে সুতা তৈরি

চিত্র ৪.৫ চরকায় তুলা থেকে সুতা তৈরি

তুলার বিড়াটি নাও। একে হাতে গুটিয়ে সুতো তৈরি করতে চেষ্টা করো। এই সুতো তোমার দেখা সুতোর মতো সরু হচ্ছে কি? সুতো তৈরির জন্য যন্ত্র আছে। গান্ধীজি তকলি ও চরকাতে সুতো কাটতেন ও সকলকে সুতো কাটার জন্য উৎসাহ দিতেন। ওই সময় সবাই তাঁতের তৈরি কাপড় পরত।

হাত দিয়ে কিছু শণের দড়ি তৈরি করো। আজকাল বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে সুতো কাটা হয় ও কাপড় তৈরি হয়।

৪.৫ সুতো থেকে কাপড় তৈরি

চিত্র ৪.৬ শীতবস্ত্র তৈরি

উপরের ছবিটি দেখো। এই চিত্রটিতে হাতে করে পশম সুতার শীতবস্ত্র কেমন করে তৈরি হয় দেখানো হয়েছে। তোমার বাড়িতে কেউ কি এই কাঁটা দিয়ে সোয়েটার মাফলার বোনে?

তাঁতের সাহায্যে শাড়ি, ধুতি, গামছা ইত্যাদি বোনা হয়। (নীচের ছবিটি দেখো)। সমাজে এখন এর প্রচুর ব্যবহার হয়। আজকাল বড় বড় কলকারখানায় কাপড়, শীতবস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। তবুও তাঁতের শাড়ি, চাদর ইত্যাদির চাহিদা আজও রয়েছে। ওড়িশার সম্বলপুর, সোনপুর, আঠগড়, ব্রহ্মপুর প্রভৃতি জায়গায় তাঁতের কাপড় বোনা হয়। ওড়িশার তাঁতের তৈরি তসরের শাড়ির চাহিদা ভারতের বাইরেও রয়েছে। তোমার গ্রামে যেখানে তাঁতের কাপড় বোনা হয় সেখানে গিয়ে দেখো।

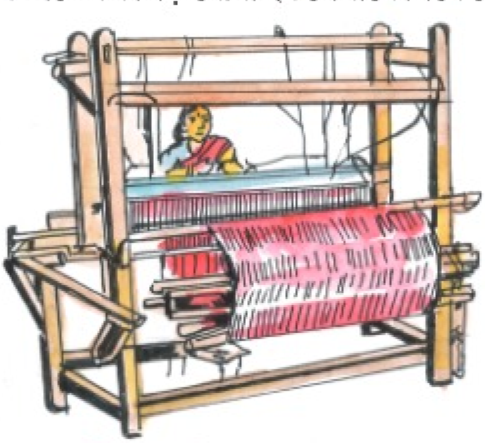

ছবি ৪.৭ তাঁতে কাপড় বোনা হচ্ছে।

কী জানলে

- তুলা, পাঠ, রেশম, পশম এক ধরনের তন্তু।
- রেশমের গুটিপোকা থেকে রেশম সুতো তৈরি হয়।
- পশম প্রধানত ভেড়ার লোম থেকেও পাওয়া যায়। এছাড়া ছাগল ও চমরী গাভীর লোম থেকেও পাওয়া যায়।
- কাপাস তুলো চাষের জন্য কালো কপাস মাটি ও পাট চাষের জন্য পলি মাটি আবশ্যক।
- ওড়িশার সম্বলপুর, সোনপুর, আঠগড়, ব্রহ্মপুর ইত্যাদি অঞ্চলে তাঁতের কাপড় বোনা হয়।

অভ্যাস

১. কোন্ শব্দটি ওই শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত নয়।

(ক) পাট, তুলা, পলিস্টার, পশম

(খ) তুলা, পাট, পশম, পাঁকাটি

(গ) তুলা, রেশম, পশম, নারকেল দড়ি

২. নীচে দেওয়া দুটি শব্দের মধ্যে একটি করে সামঞ্জস্য ও পার্থক্য লেখো।

(ক) রেশম ও পশম

(খ) প্রাকৃতিক তন্তু ও কৃত্রিম তন্তু

৩. কারণ কী ?

(ক) পশ্চিমবঙ্গে বেশি পাট চাষ করা হয়।

(খ) সুরাটে অনেক কাপড়ের কল আছে।

৪. প্রত্যেকের দুটি করে ব্যবহার লেখো।

(ক) নারকেল তন্তু (খ) শিমুল তুলো (গ) শণ

৫. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) শণ ——— গাছের আঁশ।

(খ) শিমুল গাছের তুলো ——— উড়ে যায়।

(গ) নাইলন একটি ——— তন্তু।

(ঘ) রেশম পোকা থেকে ——— রেশম পাওয়া যায়।

৬. শীতের সময় পরার জন্য সোয়েটার ও গরমের সময় ব্যবহৃত জামা যে সব সুতোয় তৈরি হয়, উদাহরণ দিয়ে সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

বাড়িতে বসে করো:

- তোমার গ্রামে যদি কোথাও তাঁত বা কলের সাহায্যে কাপড় বোনা হয় তবে সেখানে যাও ও সেখানে কী দেখলে সে বিষয়ে লেখো।

পঞ্চম অধ্যায়

বস্তুর প্রকারভেদ

আগের অধ্যায়গুলিতে তুমি পড়েছ যে আমাদের খাদ্য ও পোশাক নানা রকমের দেখা যায়। শুধু খাদ্য ও বস্ত্র কেন, আমাদের চারপাশে ভরে থাকা নানা জিনিসপত্রের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখতে পাই। চেয়ার, টেবিল, গরুর গাড়ি, সাইকেল, মোটর গাড়ি, বাসনকোসন, খাতা, বই, কলম, টিভি ইত্যাদি বস্তু আমরা কাছ থেকে দেখি ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা আলাদা কাজে ব্যবহার করি। গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, বিল, উদ্যান, বনপাহাড়, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদিও আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত। ভেবে দেখো তো, এসবই কি একই প্রকারের জিনিস। এগুলোর আকার, আকৃতি, রং ইত্যাদি সব কি এক ধরনের? এগুলি কি আমরা একই কাজে ব্যবহার করি? ভেবে দেখো তো, আমরা যে কাচ বা ধাতু বা প্লাস্টিক গ্লাসে জল খাই তার বদলে কাপড়ে তৈরি গ্লাসে জল খেতে পারি কি? মাটি বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে আমরা রান্না করি। তার বদলে কাগজের তৈরি হাঁড়িতে কি রান্না করা যায়? তুমি জানো এগুলো ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে ও সে অনুসারে এদের নানা রকমের কাজে ব্যবহার করা হয়।

৫.১ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য।

আমাদের দেখা ও ব্যবহার করা নানান জিনিসের মধ্যে কিছু মিল থাকে। আবার অনেক অমিলও দেখা যায়। আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা জিনিসগুলো বেছে ব্যবহার করি। সব জিনিস সব কাজে ব্যবহার করা যায় না। কারণ সবার গুণ সমান হয় না। চাল, গম, মাড়ুয়া, ডাল, শাক-সবজি, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি। কার্পাস, রেশম, পশম, নাইলন ইত্যাদি থেকে তৈরি। সুতো থেকে আমরা যেসব জামাকাপড় পরি সেগুলো বানানো হয়। ইট, বালি, পাথর, মাটি, সিমেন্ট, টিন, লোহা, কাঠ, বাঁশ, খড়, টালি ইত্যাদি দিয়ে আমাদের ঘর-বাড়ি তৈরি হয়। এটা ঠিক যে, খাদ্যসামগ্রী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয় না। তেমনি বাড়ি তৈরির জন্য দ্রব্যসামগ্রী আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করতে পারি না। এমন কেন হয়? কারণ এসব বস্তুর গুণ সমান নয়। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে তেমনি সাদৃশ্যও থাকতে পারে।

তোমার দেখা ও ব্যবহার করা বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। সেসবের উৎস হয়তো একই পদার্থ। নীচের ৫.১ সারণীতে এরকম কিছু বস্তুর মূল পদার্থ দেখানো হয়েছে। তুমি এই তালিকাটি তোমার খাতায় লিখে পূরণ করলে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে মিল ও অমিল জানতে পারবে।

সারণী ৫.১ জিনিসগুলোর মধ্যে মিল-অমিল

কাঠের তৈরি	কাচের তৈরি	মাটির তৈরি	প্লাস্টিকের তৈরি	ধাতু নির্মিত
খাট/পালঙ্ক	গ্লাস মাটির	কলসি	চিরুনি	লোহার পেরেক

৫.২ বস্তুর শ্রেণীবিভাগ

তোমার শ্রেণীগৃহে থাকা জিনিসপত্রের একটি তালিকা করো। ওই জিনিসগুলোর শ্রেণীবিভাগ করবার জন্য—

- প্রথমে ভালো করে দেখো সেগুলো স্বচ্ছ না অস্বচ্ছ, রং দেওয়া নাকি রং না দেওয়া।
- তার পরে হাত দিয়ে দেখো তা মসৃণ না এবড়োখেবড়ো।
- এরপরে চাপ দিয়ে দেখো তা শক্ত না নরম।
- এবার জিনিসগুলো হাত দিয়ে তুলে তা ভারি না হালকা পরীক্ষা করো।
- পরিশেষে জিনিসগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্যের এক তালিকা করো।

আর এক দিক দিয়ে দেখলে কিছু বস্তু জীব ও অন্য কিছু নির্জীব শ্রেণীতে পড়ে। কিছু দ্রব্যসামগ্রী প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়। তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। মানুষের তৈরি বস্তুকে কৃত্রিম বস্তু বলা হয়। বস্তুর এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ তুমিও করতে পার।

নীচে (ক) ও (খ) তালিকা দেওয়া হল। ওই রকম তালিকা তোমার খাতায় লিখে তার মধ্যে থাকা শূন্যস্থান পূরণ করো। তাহলে তুমি জানতে পারবে বস্তুগুলোর কীভাবে শ্রেণীবিভাগ হয়েছে।

তালিকা ৫.২ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুর শ্রেণীবিভাগ

প্রাকৃতিক	কৃত্রিম
কাঠ	চেয়ার, টেবিল
পাথর	
লোহা	
খনিজ তেল	
পাট	
মাটি	
বক্সাইট	

(খ) জীব ও নির্জীব

জীব	নির্জীব
গাছ	বাড়ি

৫.৩ বস্তুর গুণ

প্রত্যেক বস্তুর দুটি মৌলিক গুণ থাকে। যথা:

- তা কিছু স্থান অধিকার করে
- তার বস্তুত্ব থাকে

বস্তুর অন্য কতকগুলি গুণ হল তার রং/বর্ণ, তার পশ্চাদ্ভাগের মসৃণতা/ রুক্ষতা, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, দ্রবণীয়তা ইত্যাদি। আমরা কিছু কাজের মাধ্যমে বস্তুর এই গুণ বিষয়ে আরও কিছু জানব। এর ফলে আমরা জানতে পারব যে কোন্ বস্তু কোন্ কাজের জন্য উপযুক্ত। (নীচে কতকগুলো জিনিসের নাম দেওয়া হল, মাস্টারমশাই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সেগুলো সংগ্রহ করবেন)। ডাস্টার থেকে আলাদা হওয়া টুকরো কাঠ, একটি চক, একটুকরো পোড়া কয়লা, একটি সেফ্‌টিপিন, একটি পেরেক, একটি রঙিন চিরুণী, অ্যালুমিনিয়ামের বাটি, একটা নতুন চামচ, একটা আয়না, টুকরো কার্ডবোর্ড, পেনসিলের লেখা মোছার রবার, এক চামচ চিনি, এক চামচ নুন, একটু কাগজিলেবুর রস, একটু কেরোসিন, একটু সরযের তেল, কিছু বালি, কিছু কাটা খড় বা তৃণখণ্ড, কয়েকটা কাচের বাটি, একটা পরিষ্কার কাচের বোতল, একটা মোমবাতি, একটা পেপার ওয়েট।

এবার ওগুলোর মধ্যে কয়েকটির গুণ বিষয়ে জানার চেষ্টা করি।

সারণী ৫.৩ বস্তুর গুণগত শ্রেণীবিভাগ

বস্তু	বস্তুর বাহ্যরূপ	বর্ণ	রুক্ষতা	কঠিনতা
কাঠের টুকরো	অধাতু, অনুজ্জ্বল,	ব্যবহৃত রং অনুসারে রঙিন	রুক্ষ	কঠিন
কয়লা				
পরিষ্কার বালি				
চক				
স্টিলের চামচ				

তোমার কাজ: ১

ডাস্টারের কাঠ, কয়লা, পরিষ্কার বালি, চক, সেফটিপিন, স্টিলের চামচ—এগুলো সব দেখো। এগুলোর ওপরে হাত দিয়ে ভাবো। হাত দিয়ে যা অনুভব করলে তা উপরের সারণী ৫.৩-তে ঠিক জায়গায় লেখো। এর দ্বারা আমরা এই বস্তুগুলোর কয়েকটি গুণ জানতে পারব।ও সেই অনুসারে সেগুলোর শ্রেণীবিভাগ করতে পারব।

এই শিক্ষণ প্রণালীর মাধ্যমে তুমি জানলে যে, সব বস্তুর রং এক ধরনের নয়। সব কঠিন বা নরম নয়। সব বস্তুর বাহ্যরূপ এক রকমের চিক্কণ নয়।

তোমার কাজ: ২

সারণী ৫.৩-এর মতো একটি সারণী তোমার খাতায় লেখো। তোমার কাছে যে সব পদার্থ আছে সে সব পদার্থের এই গুণগুলো তালিকার উপযুক্ত স্থানে লেখো এবং শ্রেণীবিভাগ করো। প্রয়োজন হলে তোমার বন্ধু ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

এক চামচ চিনি, একটু কেরোসিন, একটি কাচের বাটি, কিছু পরিষ্কার বালি, কিছু কুটা বা খড়কুটা নাও। চারটি পাত্রে এক কাপ করে জল ঢালো। চিনি, কেরোসিন, কাচের টুকরো ও খড়কুটাকে আলাদা আলাদা পাত্রের জলে ফেলে চামচ দিয়ে ঘেঁটে মেশাতে চেষ্টা করো। এর ফলে যা জানা গেল তা নীচের তালিকা নং ৫.৪-এ লেখা হয়েছে। তালিকাটি ভালোভাবে দেখলে তুমি জানতে পারবে কোন্ বস্তুর কী গুণ।

সারণী ৫.৪ বস্তুর গুণ ও প্রকারভেদ

বস্তু	জলে দ্রবণীয়তা	জলের থেকেভারী বা হালকা
চিনি	দ্রবণীয়	ভারী
কেরোসিন	দ্রবণীয় নয়।এটি জলের উপরে আলাদা একটি স্তর তৈরি করে।	হালকা
কাচের টুকরো	দ্রবণীয় নয়।এটি জলের তলায় রয়ে যায়।	ভারী
পরিষ্কার বালি	দ্রবণীয় নয়।এটি জলের তলায় রয়ে যায়।	ভারী
কুটা বা খড়কুটা	দ্রবণীয় নয়।এগুলো জলের ওপরে ভাসে।	হালকা

আগের তালিকা দেখে তুমি জেনেছ যে, সব বস্তু জলে দ্রবণীয় নয়, আবার সব বস্তু জলের চেয়ে ভারীও নয়। তুমি আগের তালিকার মতো নিজের খাতায় একটি তালিকা করো এবং তোমার কাছে থাকা বস্তুগুলির গুণ পরীক্ষা করে তালিকার উপযুক্ত স্থানে লেখো। তোমার সহপাঠী ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে ওই দ্রব্যগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলি জলে দ্রবণীয়, কোন্‌গুলি অদ্রবণীয়, কোন্‌গুলি জলের চেয়ে ভারী ও কোন্‌গুলি জলের চেয়ে হালকা তার এক তালিকা তৈরি করো।

তোমার কাজ: ৩

তুমি মিষ্টির দোকানে কাচ বা পরিষ্কার প্লাস্টিক জার কিংবা কাচের থালা বা শোকেসে যে মিষ্টি রাখা হয় তা দেখেছ। এভাবে রাখার ফলে জার না খুলেও বাইরে থেকে ওই সব মিষ্টি দেখা যায় ও তোমার পছন্দমতো তা দেখানো যায়। এই সব মিষ্টি কাগজ বা পিচবোর্ড কার্টুন ভিতরে রাখলে বাইরে থেকে দেখা যায় না। এমন কেন হয় ?

একটি টর্চ নাও ও তার সুইচ টিপে সামনের দিকে তাকাও। বেশ কিছু দূরে আলো পড়বে। টর্চ লাইটের সামনে একটি কাচের গ্লাস রাখো। দেখবে, টর্চের আলো গ্লাসের ভিতর দিয়ে গ্লাস থেকে দূরে পড়ছে। টর্চ লাইটের সামনে কার্ডবোর্ডটি রেখে দেখো। আলো কার্ডবোর্ড ভেদ করে বাইরে পড়ছে কি না ? কার্ডবোর্ড তার ভিতর দিয়ে আলোকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না। এরপর একটি অন্ধকার জায়গায় গিয়ে কার্ডবোর্ডটি সরিয়ে সে জায়গায় তোমার করপদ্ম রেখে টর্চ দেখাও। কী দেখছ? টর্চের আলোয় তোমার হাতের পাপুলির রং একটু লাল দেখা যাবে। শেষে একটুকরো সাদা কাগজের মাঝখানে দুফোঁটা তেল দিয়ে ঘসে দাও। সেই জায়গায় টর্চের আলো ফেলে দেখো। কী দেখছ ?

এখন তুমি দেখলে যে টর্চের আলোর সামনে কিছু না থাকায় কেবল বাতাসে আলো সামনে পড়ছে। কিন্তু যখন টর্চের আলোর আগে কার্ডবোর্ড রাখা হচ্ছে তাতে আলো আটকে যাচ্ছে। সুতরাং বাতাস ও কাচ—এদের ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারছে। এদের স্বচ্ছ বস্তু বলা হয়। এবং কার্ডবোর্ডের মতো বস্তুকে অস্বচ্ছ বস্তু বলা হয়। তেল ঘসা কাগজ, যার ভিতর দিয়ে আলো আংশিকভাবে যেতে পারে, তাকে অল্প স্বচ্ছ বস্তু বলা যেতে পারে।

তোমার হাতের পাপুলি কোন্ শ্রেণীর, বলতে পারো ?

তোমার খাতার নীচের সারণী ৫.৫-এর মতো একটি সারণী তৈরি করো। এই সারণী দেখে তোমার দেখা ও জানা দশটি বস্তুর শ্রেণীবিভাগ করো।

সারণী ৫.৫ স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ ও অল্প স্বচ্ছ গুণ

বস্তু	স্বচ্ছ	অস্বচ্ছ	অল্প স্বচ্ছ

- ভেবে লেখো।
- বড় বড় যানবাহন যথা: কার, বাস, ট্রাক ইত্যাদি সম্মুখভাগ কাচে তৈরি হয় কেন?

- যানবাহনের সামনের কাচে Wipers লাগানো হয় কেন?

তোমার কাজ: ৪

তুমি সংগ্রহ করে রাখা প্লাস্টিক চিরুণী, কার্ডবোর্ড, কাঠগুঁড়ো, চক, অ্যালুমিনিয়ামের বাটি, স্টিল চামচ ইত্যাদি একটি জায়গায় সাজিয়ে রাখো, সেগুলি মেজে পরিষ্কার করো।

তুমি দেখবে কাঠ, কয়লা, কার্ডবোর্ড, চক, প্লাস্টিক চিরুণী ইত্যাদি চকচক করে না। কিন্তু তামার তার ও অ্যালুমিনিয়ামের বাটি, স্টিল চামচ চকচক করছে। বস্তুর চকচক দেখতে পাওয়া গুণকে উজ্জ্বলতা বলা হয়।

বস্তুর এই গুণকে লক্ষ রেখে আমরা সেগুলির দুপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। কাঠ, কয়লা, কার্ডবোর্ড, চক ও প্লাস্টিক চিরুণীকে অনুজ্জ্বল বস্তু বলা হয়। তামার তার, অ্যালুমিনিয়াম বাটি, স্টিল চামচকে উজ্জ্বল বস্তু বলা হয়।

তোমার খাতায় সারণী তৈরি করো। এই সারণীতে তোমার আশেপাশের দেখতে পাওয়া দশটি বস্তুর শ্রেণী নির্ণয় করো।

সারণী ৫.৬ বস্তুর উজ্জ্বলতা গুণ

বস্তু	উজ্জ্বল
স্টিলের চামচ	উজ্জ্বল
মোমবাতি	অনুজ্জ্বল

এখন বস্তুর উপরোক্ত গুণগুলি যে কত উপাদেয় তুমি তা অনুভব করতে পারবে।

কী শিখলাম:

- যখন অনেক বস্তু নিয়ে অনুধ্যান করা যায়, তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য জানা যায়।
- প্রত্যেক বস্তুর কিছু গুণ থাকে। এই গুণকে আধার করে বস্তুগুলির প্রকারভেদ করা যায়।
- বস্তুর শ্রেণী অনুসারে যখন শ্রেণীবিভাগ করা হয় তখন আমরা দেখি কিছু বস্তু প্রাকৃতিক ও অন্য কতকগুলি মনুষ্যকৃতি। কিছু বস্তু জীব ও অন্য কতকগুলি নির্জীব।
- বস্তুর গুণগুলির মধ্যে এর বাহ্যরূপ, বর্ণ, রুক্ষতা, কঠিনতা, জলে দ্রবণীয়তা, জলের চেয়ে ভারী নাকি হালকা, উজ্জ্বলতা ইত্যাদি জানা যায়।
- বস্তুর উপরে আলো ফেলে তাদের স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ ও অল্পস্বচ্ছভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

মনে রেখো:

বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণের সময় বিভিন্ন বস্তুর গুণের উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিভাগ করা এক উপযোগী প্রক্রিয়া।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত বস্তুগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রাকৃতিক নয়?

(ক) কাঠ (খ) কাগজ (গ) খনিজ তেল (ঘ) মাটি

২. নিম্নলিখিত বস্তুগুলির মধ্যে কোন্‌টি নির্জীব?

(i) (ক) সাপ (খ) তোমার ভাঙা দাঁত (গ) শামুক (ঘ) গজানো ছোলা

(ii) (ক) গোটামুগ (খ) মুগডাল (গ) গজানো মুগ (ঘ) মুগ গাছ

৩. প্রথম দুইটির সম্পর্ক দেখে তৃতীয় শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দটি শূন্যস্থানে লেখো।

(ক) কাঠ: অস্বচ্ছ :: কাচ: ———

(খ) চিনি: দ্রবণীয় ::——— :: অদ্রবণীয়।

(গ) সুনা : ধাতু :: কয়লা : ———।

(ঘ) জলে ডুবে যাওয়া : কাঁকর :: ভাসা ———।

৪. শক্ত ও নরম ধরনের ভেদ লক্ষ্য করে নিম্নলিখিত বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ করো।

(ক) আলপিন (ঙ) রবার

(খ) সাবান (চ) সোল

(গ) তুলার বিড়া (ছ) ডট পেন ভিতরের স্প্রিং

(ঘ) বরফ

৫. কোন্ বাক্যটি ঠিক?

(ক) তোমার বইয়ের পাতার উজ্জ্বলতা আছে।

(খ) ইউরিয়া সার জলে দ্রবণীয়।

(গ) খড় কাঠ জলে ভাসে।

(ঘ) কাচ এক স্বচ্ছ বস্তু।

৬. নিম্নলিখিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে দুটি সাদৃশ্য ও দুটি পার্থক্য লেখো।

(ক) অ্যালুমিনিয়াম, রবার

(খ) কাচের গুঁড়ো, নুন

(গ) সোল, স্টিল চামচ

(ঘ) কেরোসিন, পারদ

বাড়িতে বসে করো:

- তোমার রান্নাঘরে ব্যবহার করা জিনিসগুলির এক তালিকা করো। গুণ অনুসারে সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বস্তু ও পদার্থের পরিবর্তন

আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা বস্তু ও পদার্থগুলি সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। লক্ষ্য করলে এই পরিবর্তনগুলি তুমি দেখতে পাবে ও সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়েও জানতে পারবে। এদের মধ্যে কতকগুলির পরিবর্তন অতি সাধারণ যা তোমার একেবারে কাছেই ঘটে। এদের জানার জন্য বিশেষ কিছু অসুবিধা নেই। কিন্তু আর কিছু পরিবর্তন হয় যা জানতে ও বুঝতে তোমার সামান্য কিছু চেষ্টা করতে হয়।

৬.১ বস্তু ও পদার্থের পরিবর্তন

তোমার দেখা বস্তু ও পদার্থগুলির পরিবর্তনের এক তালিকা করো। তালিকা প্রস্তুত করার সময় এই পরিবর্তন কোথায় কীভাবে হয়, যথা : প্রাকৃতিক উপায়ে পরিবর্তন ও মনুষ্যকৃত পরিবর্তন। এগুলি তোমার খাতায় লেখো।

সারণী ৬.১ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত পরিবর্তন

বস্তু/পদার্থ	প্রাকৃতিক পরিবর্তন	মনুষ্যকৃত পরিবর্তন

উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি অনুধ্যান করার সময় আরও কতকগুলি পরিবর্তনের কথা মনে রাখা দরকার। যথা: বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে আবশ্যকীয় বস্তু তৈরি করা, যেমন কার্পাস থেকে সুতো ও সুতো থেকে বস্ত্র, লোহা থেকে শাবল, কোদাল, কড়াই, লোহার পেরেক ইত্যাদি, সোনা, রুপা থেকে গয়না ও অ্যালুমিনিয়াম থেকে বাসনপত্র ইত্যাদি। এমনি অনেক পরিবর্তনের কথা বিচার করার সময় আমরা দেখব যে, সব পরিবর্তন কিন্তু এক প্রকার নয়। উপরে দেখানো সারণীর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ওইগুলি আলাদা আলাদা বিচার করা গেলেও অন্য উপায়েও এগুলি বিভক্ত করা যেতে পারে। এজন্য অবশ্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুলির কারণ উপরে নির্ভর করতে হবে। এখন একটি সরল ও সহজ কাজের মাধ্যমে এই বিভক্তিকরণের কাজ আরম্ভ করা যাক।

৬.২ বস্তু ও পদার্থের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন:

তোমার কাজ: ১

একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে চিনামাটির প্লেটের উপরে রাখো। জ্বলন্ত মোমবাতিটি দেখো ও যা দেখলে লেখো। কী দেখলে?

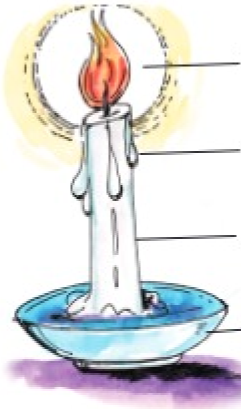

চিত্র ৬.১ মোমবাতির পরিবর্তন

মোমাবাতিটি জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল। শেষে প্লেটের উপরে কী রইল তা দেখলে তো?

উপরোক্ত কাজে আমরা কী দেখলাম ও তার দ্বারা কী শিখলাম তা এবার আলোচনা করব।

(ক) মোমবাতিটি মোম দিয়ে তৈরি। মোম দহনীয় পদার্থ হওয়ায় মোমবাতির পলতেতে আগুন লাগলে তা জ্বলে।

(খ) মোমবাতি জ্বললে কিছু মোম গলে যায় ও গা বেয়ে বইতে থাকে। শেষে, অবশিষ্ট গলিত মোম জ্বলে যায়।

(গ) মোমবাতি জ্বলার সময় আলো ও উত্তাপ দেয়।

(ঘ) মোম উত্তাপের ফলে গলতে থাকে ও নীচের দিকে বয়ে এসে ঠান্ডা হয়ে প্লেটের উপরে আবার শক্ত মোমে পরিবর্তিত হয়। বলো তো মোমবাতিতে যত মোম ছিল সেসব কি এখন ওই প্লেটে আছে? বাকি সব গেল কোথায়?

(ঙ) মোমবাতি জ্বলে শেষ হওয়ার সময় এর বেশিরভাগ শেষ হয়ে যায়। তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

(চ) প্লেটের কঠিন মোম নিয়ে পুনরায় জ্বালানো যায় এমন মোমবাতি তৈরি করা যায়।

উপরোক্ত তথ্য উপরে আলোচনা করলে আমরা জানতে পারব যে, মোমবাতি জ্বলার সময় মোমের দু'প্রকার পরিবর্তন হয়। প্রথমত দহন ও তজ্জনিত ক্ষয়। এটি এক স্থায়ী পরিবর্তন। এটি এক অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তনও বটে। কারণ মোম আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু অল্প মোমের ভৌতিক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে শক্ত থেকে তরল মোম ও আবার তরল মোম ঠান্ডা হয়ে শক্ত মোম পরিবর্তিত হয়, এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা এক পরিবর্তন। ইহা অস্থায়ী ও প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন। কারণ এখানে শক্ত মোম তরল মোমে ও সেই গলিত মোম ঠান্ডা হয়ে আগের মতো শক্ত মোমে পরিণত হতে পারে।

এখন তুমি তোমার জানা কয়েকটি পরিবর্তনের কথা মনে করো। তোমার খাতায় একটি সারণী তৈরি করে লেখো।

সারণী ৬.২ বস্তু ও পদার্থের স্থায়ী-অস্থায়ী বা অপ্রত্যাবর্তী প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন

স্থায়ী বা অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন	অস্থায়ী বা প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন
কাঠ জ্বেলে কয়লা তৈরি হয়।	বরফ গলিয়ে জল পাওয়া যায়

কিছু বস্তু উত্তপ্ত হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কয়েকটি কাজের মাধ্যমে তা জানব।

৬.৩ পরিবর্তনে তাপের প্রভাব

তোমার কাজ: ২

একটি ফিউজ বাল্ব নাও। এর গালার অংশ ভেঙে বের করে দাও। বাল্বের খোলা মুখে একটি বেলুন সুতা দিয়ে বাঁধো। বাল্বটির নীচে জ্বলন্ত মোমবাতি দেখিয়ে গরম করো। এখন বেলুনটি লক্ষ্য করো। কিছু সময়ের মধ্যে সংকুচিত বেলুনটি ফুলে উঠবে। বাল্বটি আর গরম না করে ঠান্ডা করো। দেখবে বেলুনটি সংকুচিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

চিত্র: ৬.২ বেলুনে তাপের প্রভাব

উপরোক্ত কাজ থেকে আমরা জানতে পারি বাল্বটি গরম করার ফলে তার ভিতরের বায়ু প্রসারিত হয়ে বেলুনের ভিতরে ঢুকেছে তাই বেলুনটি ফুলে উঠেছে। শেষে বাল্বটিকে ঠান্ডা করার জন্য বায়ু সংকুচিত হয়ে যায়। কাজেই বেলুন ভিতরের বায়ু বাল্বের ভিতরে ফিরে আসে এবং বেলুনটি সংকুচিত হয়ে যায়।

এবার তুমি বলো, বায়ু উপরে তাপের প্রভাব কতটুকু? উপরের উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে তাপের প্রভাবে বায়ু প্রসারিত হয় এবং শীতল হলে বায়ু সংকুচিত হয়।

আগের ছবিতে আমরা দেখেছি তাপের প্রভাবে মোম গলে গিয়ে কঠিন অবস্থা থেকে তরল হয়। আবার তরল মোম খুব বেশি ঠান্ডা হলে রূপ বদলে কঠিন আকার নেয়।

জল গরম করলে বাষ্প হয়, বাষ্প ঠান্ডা হলে আবার জল হয়। জলকে বেশি ঠান্ডা করলে জল বরফ হয়ে যায়।

এই সব উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, তাপ প্রয়োগ করলে বস্তু বা পদার্থের ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। যথা:

তাপ প্রয়োগ করলে
কঠিন পদার্থ ⇄ তরল পদার্থ
ঠান্ডা হলে

তাপ প্রয়োগ করলে
তরল পদাথ ⇄ গ্যাসীয় পদার্থ
ঠান্ডা হলে

অদরকারী কাগজ টুকরো বা ছেঁড়া কাপড় একটি পরীক্ষা নলে রেখে খুব বেশি উত্তপ্ত করলে কী হবে? ওগুলো জ্বলে যাবে।

এর থেকে আমরা কী জানলাম ?

অধিক উত্তাপের ফলে দহনীয় বস্তু বা পদার্থগুলি যথা: কাগজ, তুলা, কাপড়, মোম, কেরোসিন, পেট্রোল, রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস, শুকনো পাতা, কাঠ ও কয়লা ইত্যাদি জ্বলে যায়।

কিন্তু ধাতব পদার্থটিকে গরম করলে কী হয় ? এটা জানার জন্য এসো একটি কাজ করে দেখি।

তোমার কাজ: ৩

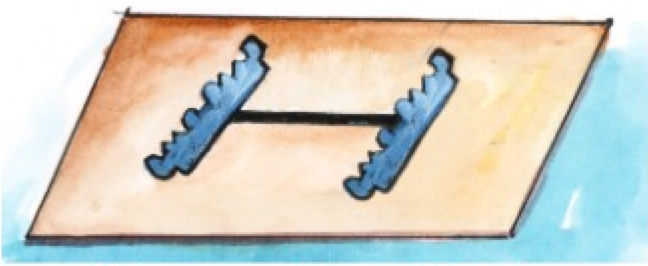

চিত্র: ৬.৩ ধাতু উপরে তাপের প্রভাব

একটা মোটা মলাট পাটা বা একটা কার্ডবোর্ড নাও। পাটার মাঝ থেকে একটি ধাতব এক টাকার মুদ্রার ব্যাস মাপের একটুকরো কেটে বের করে দাও। এর ফলে চিত্রে দেখানোর মতো সংকীর্ণ একটি রাস্তা দেখতে পাব। একটি ব্লেড মাঝখান থেকে ভেঙে দু'টুকরো করো। এই দুটি ব্লেড টুকরোকে কার্ডবোর্ড কাটার জায়গার দুদিকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। ওই ধাতব এক টাকার মুদ্রা নিয়ে এবার দেখো যেন কেটে দেওয়া ফাঁক দিয়ে তা যেতে পারে। বেশি ঢিলা যেন না হয়।

ধাতব মুদ্রাটি চিমটে দিয়ে ধরে মোমবাতি বা স্পিরিটের আলোতে গরম করো। এবার সেই গরম মুদ্রাটি কার্ডবোর্ড কাটা জায়গা দিয়ে পার করো। দেখবে যে মুদ্রাটি দু'টুকরো ব্লেডের মাঝখান দিয়ে গলতে পারছে না, কারণ মুদ্রাটি উত্তপ্ত হওয়ার পরে এর আকার সামান্য বেড়ে গেছে।

ওই মুদ্রাটি ঠান্ডা হওয়ার পরে, আগের মতো তা আবার সেই জায়গা দিয়ে গলে যাবে।

তাহলে উপরের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা কী শিখলাম ?

ধাতব পদার্থ উত্তপ্ত হলে আকারে বেড়ে যায়। ঠান্ডা হওয়ার পর তা সংকুচিত হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। মুদ্রার এই পরিবর্তনকে আমরা কী ধরনের পরিবর্তন বলব ? **এই পরিবর্তনকে অস্থায়ী, প্রত্যাবর্তী বা ভৌতিক পরিবর্তন** বলতে পারি।

বলো দেখি ?

- গরুর গাড়িতে লোহার পাত জড়ানো চাকা ঘুরতে দেখেছ? তা ঘোরার সময় চাকার কী ধরনের পরিবর্তন হয় জানো? লোহার তৈরি চাকার বেড় উত্তপ্ত না হলে চাকা দিয়ে মাড়ানো যায় না।
- একটি কাচের বোতলে লাগানো ধাতু নির্মিত ছিপি জাম হয়ে যাওয়ায় খোলা যাচ্ছে না। সেই ছিপি না কেটে বোতল না ভেঙে কীভাবে খুলবে? ছিপি খোলার প্রক্রিয়াকে কী ধরনের পরিবর্তন বলা হয় ?

তোমার কাজ: ৪

একটি পাত্রে এককাপ জল নিয়ে তাতে আধ চামচ খাবার নুন ঘেঁটে নাও। নুন জলে মিশে যাবে। এই নুন মেশা জল চাখলে কেমন লাগবে?

সেই নোনা জল ওই পাত্রে গরম করো, সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেলে শেষে পাত্রে কী রইল দেখো।

এই কাজের মধ্যে কী কী পেলে? এর থেকে শিখলেই বা কী?

- নুন জলে মিশে গেলেও নুনের স্বাদে কোনো পরিবর্তন হয় না।
- নুনজল থেকে জল বাষ্পরূপে উড়ে গেলেও গোলানো জলে বয়ে যাওয়া কঠিন পদার্থও নোনতা লাগে। কারণ এ আর কিছু নয়; প্রথমেই ঘেঁটে দেওয়া সেই নুন, এভাবে নুনের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা **অস্থায়ী ও প্রত্যাবর্তী**।

তোমরা আরও কয়েকটি ভৌতিক পরিবর্তনের উদাহরণ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো। ওগুলোকে কেন ভৌতিক পরিবর্তন বলা হয় তার কারণ লেখো।

- ভিজা কাপড় রোদে শুকিয়ে যাওয়া ও মিছরির ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো করা কি ভৌতিক পরিবর্তনের উদাহরণ?

বস্তু ও পদার্থের আরও কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। যা উপরে বর্ণিত পরিবর্তনগুলির চেয়ে আলাদা।

তোমার কাজ: ৫

একটি ছোট ম্যাগনেশিয়ামের পাতকে চিমটা দিয়ে ধরে স্পিরিটের লম্ফ বা মোমবাতিকে গরম করো। এর ফলে ম্যাগনেশিয়াম উজ্জ্বল আলো বিস্তার করে জ্বলে উঠবে ও সাদা ছাইয়ের মতো এক নতুন পদার্থে পরিণত হবে। এর রাসায়নিক নাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড। এটা এক স্থায়ী ও অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন।

তোমার কাজ: ৬

একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ গুঁড়ো পোড়া চুন নিয়ে তার মধ্যে কিছু পরিমাণ পরিষ্কার জল মেশাও। দেখবে, জল টগবগ করে ফুটবে ও ওই পাত্রটি খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। শেষে এটা কলিচুনে পরিবর্তিত হয়।

এই পরিষ্কার জল থেকে একটু জল নিয়ে অন্য একটি বাটিতে ঢালো। চুনজলের মধ্যে একটি সরবত পাইপ ঢুকিয়ে ফুঁ দাও। কিছু সময় পরে দেখবে স্বচ্ছ চুনজলের রং সাদা হয়ে গেছে এবং একে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে তা থিতিয়ে পাত্রটির নীচে একটি সাদা পদার্থ পড়ে থাকবে। এই পদার্থটি দানা-সদৃশ একটি নতুন পদার্থ। এর রাসায়নিক নাম ক্যালশিয়াম কার্বোনেট। এই পরিবর্তন হল **স্থায়ী ও অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন।**

তোমার কাজ: ৭

একটি স্টিলের চামচে অল্প চিনি নিয়ে গরম করো। চিনি প্রথমে হলুদ তারপরে বাদামি ও শেষে কালো হয়ে যাবে। ঠান্ডা করে একে চেখে দেখলে মিষ্টি লাগবে না। এই পরিবর্তনের ফলে চিনি অন্য এক পদার্থে বদলে গেছে। এর রাসায়নিক নাম চিনি অঙ্গার। একে আর চিনিতে পরিণত করা যাবে না। এই পরিবর্তনটি স্থায়ী ও অপ্রত্যাবর্তী।

তোমার কাজ: ৮

একটি নলে কিছু দানা বাঁধা তুঁতে নিয়ে আস্তে আস্তে গরম করো, দেখবে প্রথমে নীল রঙের তুঁতে সাদা হয়ে যাবে এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে ওই পরীক্ষা করার নলের উপরে জলের ফোঁটা নামছে। তুঁতেকে যদি বেশি ফোটানো যায় তবে কালো রঙের এক কঠিন পদার্থ এই নলের তলায় বসে যাবে। এই নতুন পদার্থে রাসায়নিক নাম কপার অক্সাইড। এ থেকে কিন্তু আর তুঁতে তৈরি করা যাবে না। সুতরাং এ পরিবর্তন স্থায়ী ও অপ্রত্যাবর্তী।

তোমার কাজ: ৯

পরীক্ষা করার মতো একটি নলে কিছু তামার টুকরো (ছোট তার বা পাতের টুকরো) নাও। তাতে কিছু গন্ধক গুঁড়ো মেশাও। এই মিশ্রণ লাল না হওয়া পর্যন্ত গরম করো। কিছুক্ষণ পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা তার তামা বা গন্ধক থাকে না। এতে আর তামা বা গন্ধক খুঁজে পাবে না। কারণ এর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনটিও এক স্থায়ী ও অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন।

আগের আলোচনা থেকে তোমরা কী জানলে? এই পরিবর্তনগুলি যে স্থায়ী এবং অপ্রত্যাবর্তী তা তোমরা জানলে। এই পরিবর্তনগুলির শেষে যা পাওয়া যায় তা একেকটি নতুন পদার্থ। সেজন্য অবস্থার এই পরিবর্তনগুলিকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়।

তোমরা আরও কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন পরীক্ষা করে তোমার খাতায় লিখে রাখো। তাদের কেন রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়, তা বন্ধু ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো।

লোহায় মরচে ধরাকে কী ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়?

নীচের কিছু পরিবর্তনের তালিকা দেওয়া হল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেগুলো কী ধরনের পরিবর্তন তা উক্ত তালিকার ৬.৩ চিহ্নিত স্থানে টিক (✓)

৬.৪ দ্রবণ

নুন, চিনির মতো অনেক জিনিস জলে গললে তারা মিশে যায়। একের বেশি রকমের জিনিস মিশে যাওয়াকে মিশ্রণ বলা হয়। দ্রবণ এক ধরনের মিশ্রণ। তোমরা জানো, নুন ও জলের মিশ্রণে তৈরি দ্রবণ নোনতা লাগে। চিনি ও জলের মিশ্রণে তৈরি দ্রবণ মিষ্টি লাগে। এখানে জল হল দ্রাবক ও চিনি বা নুন দ্রবণীয়। জলে দ্রবীভূত হওয়া চিনি ও নুনের মতো পদার্থের এই গুণকে দ্রবণীয়তা বলে। দ্রাবকে যতক্ষণ পর্যন্ত পদার্থ দ্রবীভূত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দ্রবণকে অসংতৃপ্ত দ্রবণ বলা হয়। যে দ্রবণ দ্রবণীয়কে বেশি সময় দ্রবীভূত করতে অক্ষম ওই জাতীয় দ্রবণকে সংতৃপ্ত দ্রবণ বলা হয়। সংতৃপ্ত দ্রবণকে গরম করলে তা আরও কিছু বেশি দ্রাব্য পদার্থকে দ্রবীভূত করে।

তালিকা ৬.৩: বস্তুর বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন

পরিবর্তন	স্থায়ী	অস্থায়ী	প্রত্যাবর্তী	অপ্রত্যাবর্তী	ভৌতিক	রাসায়নিক
মাটি দিয়ে ইট তৈরি করা						
দিনের পরে রাত্রি						
গাছে পাতা পেকে যাওয়া						
জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ হওয়া						
গাছে ফল পেকে যাওয়া						
কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা						
দুধ থেকে ছানা করা						
বিরি বাটা থেকে পিঠে বানানো						
গম থেকে আটা						
তামার তার বাঁকিয়ে বালা তৈরি করা						
রবার ব্যান্ড টানা ও ছাড়া						
কাঁচা ডিম সেদ্ধ করা						

উপরের তথ্যগুলি নীচে দেওয়া কাজের সাহায্যে আলোচনা করবো।

তামার কাজ: ১০

একটি ছোট পাত্রে (স্টিলের বাটি) এককাপ পরিষ্কার জল নাও। এক চামচ নুন নিয়ে বাটির ওই জলে ঘেঁটে মেশাও। তুমি জানো ওই নুন জলে মিশে যাবে ও একটি লবণাক্ত দ্রবণ তৈরি হবে। একে অসংতৃপ্ত দ্রবণ বলা হয়। এই দ্রবণে আর এক চামচ নুন মিশিয়ে ঘাঁটলে কী হবে? চামচে করে বারবার নুন মেশালে কী হবে? তা আর জলে মিশবে না। বাড়তি নুন পাত্রে নীচে বসে যাবে। এভাবে প্রস্তুত হওয়া নুনের দ্রবণ অত্যধিক নোনতা লাগে। এ হল লবণাক্ত জলের **সংতৃপ্ত দ্রবণ**।

আমরা তবে কী শিখলাম?

নুন, জলে এক দ্রবণীয় পদার্থ হলেও এক নির্দিষ্ট পরিমাণের জল যত ইচ্ছা তত নুন দ্রবীভূত করতে পারে না।

৬.৫ দ্রবণীয়তা উপরে তাপের প্রভাব

তৈরি করা সংতৃপ্ত দ্রবণটি সেই বাটিতে রেখে গরম করো। দেখবে, দ্রবীভূত না হওয়া নুন আর নেই, মিশে গেছে। আরও নুন মেশালে হয়তো তা দ্রবীভূত হবে না। এই দ্রবণকে অতি সংতৃপ্ত দ্রবণ বলা হয়। এই দ্রবণ ঠান্ডা হলে যে অতিরিক্ত নুন মিলিয়ে গিয়েছিল তা পুনরায় কঠিন হয়ে যাবে ও বাটির তলায় বসে যাবে।

এ থেকে জানা যায় যে, **তাপের প্রভাবে দ্রবণীয়তা বেড়ে যায় ও ঠান্ডা করলে বা তাপ কমিয়ে দিলে দ্রবণীয়তা কমে যায়।** কিন্তু মনে রেখো, যে কোনো দ্রবণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ে তুমি উঁচু ক্লাসে গিয়ে আরও জানবে।

একটি সংতৃপ্ত দ্রবণে বেশি পরিমাণে দ্রাবক (এক্ষেত্রে জল) মেশালে দ্রবীভূত না হয়ে রয়ে যাওয়া দ্রাব (এক্ষেত্রে নুন) কী হয়? নিজে পরীক্ষা করে জেনে নাও।

তোমার কাজ: ১১

দুটি কাচের গ্লাসে সম পরিমাণ (আধ কাপ) পরিষ্কার জল নাও। এক চামচ নুন প্রথমে গ্লাসের জলে মিশিয়ে ঘেঁটে নাও। তা দ্রবীভূত হওয়ার পরে আর এক চামচ নুন দিয়ে ঘাঁটো। এভাবে কত চামচ নুন নিলে দ্রবণটি এক সংতৃপ্ত দ্রবণে পরিণত হয় তা সারণীতে লিখে রাখো।

তারপরে দু'নম্বর গ্লাসের জলে ওই চামচে করে একবার চিনি নিয়ে মেশাও ও ঘাঁটো। একচামচ চিনি পুরোপুরিভাবে দ্রবীভূত হয়ে গেলে আর এক চামচ চিনি মেশাতে হবে। এভাবে এক সময় দেখবে এক সংতৃপ্ত দ্রবণ তৈরি হয়ে যাবে।

এই দুটি সংতৃপ্ত দ্রবণ তৈরি করতে কোন্‌টিতে ক'চামচ চিনি ও ক'চামচ নুন প্রয়োজন হল তা ৬.৪ সারণীতে লেখো।

সারণী ৬.৪: দ্রবণীয়তা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ

দ্রবণীয় বস্তু	নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে সংতৃপ্ত দ্রবণ প্রস্তুতের জন্য ক'চামচ দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছে।
নুন	
চিনি	

তোমরা জানলে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবককে এক সমান তাপমাত্রায় (এখানে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা) ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের দ্রব্য (এখানে নুন ও চিনি) দ্রবীভূত হয়।

কী শিখলাম ?

- বিভিন্ন বস্তু ও পদার্থের পরিবর্তন ঘটে।
- পরিবর্তন নানা প্রকারের হতে পারে। যথা: স্থায়ী-অস্থায়ী, প্রত্যাবর্তী-অপ্রত্যাবর্তী, ভৌতিক-রাসায়নিক।
- তাপের প্রভাবে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয়।
- দ্রবণ প্রধানত তিন প্রকার। যথা: সংতৃপ্ত, অসংতৃপ্ত, অতি সংতৃপ্ত।
- তাপের প্রভাবে দ্রবণীয়তা প্রভাবিত হয়।
- দ্রবণীয়তাকে এক ভৌতিক পরিবর্তন বলা হয়।
- বিভিন্ন দ্রাব্যের দ্রবণীয়তা, একটি দ্রাবকের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রত্যাবর্তী, কোন্‌টি অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন লেখো।

(ক) ফুল থেকে ফল হওয়া

(খ) লজ্জাবতী পত্র স্পর্শ পেয়ে নুয়ে যাওয়া।

(গ) লোহায় মরচে পড়া।

(ঘ) লোহার টুকরোকে চুম্বকে পরিণত করা।

২. নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টি অস্থায়ী, প্রত্যাবর্তী, ভৌতিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া লেখো।

(ক) কেরোসিনে অগ্নি

(খ) মরচে পড়ায় লোহার পেরেকের বস্তুত্ব বৃদ্ধি

(খ) মরচে পড়ায় লোহার পেরেকের বস্তুত্ব বৃদ্ধি

(গ) বেশি বেশি নুন জলে দ্রবীভূত করে সংতৃপ্ত দ্রবণ তৈরি করার প্রক্রিয়া

(ঘ) ছোলাকে জলে ভিজিয়ে ফাঁপানো

(ঙ) চুম্বক লোহাকে গরম করা

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বা দুটি বাক্যে লেখো।

(ক) লোহার পেরেককে উত্তপ্ত করে লাল করা কী প্রকারের পরিবর্তন ?

(খ) রাসায়নিক পরিবর্তনের রূপ কী করে জানা যায় ?

(গ) জলে মিছরি গুলে সরবত প্রস্তুত করাকে কী ধরনের পরিবর্তন বলে ?

৪. একটি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) তুঁত জলে দ্রবীভূত হয়। এটি তার কী প্রকার গুণ ?

(খ) অতি সংতৃপ্ত দ্রবণ কাকে বলা হয় ?

(গ) তাপের পরিবর্তনে দ্রবণ কী প্রকারে প্রভাবিত হয় ?

৫. জলে দ্রবীভূত হয় না এরূপ চারটি পদার্থের নাম লেখো।

৬. কারণ নির্ণয় করো।

(ক) দুধ কেটে ছানা করা এক রাসায়নিক পরিবর্তন।

(খ) নুন গুঁড়ো করা এক রাসায়নিক পরিবর্তন নয়।

৭. পার্থক্য দেখাও।

(ক) ভৌতিক পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তন।

(খ) সংতৃপ্ত দ্রবণ ও অসংতৃপ্ত দ্রবণ

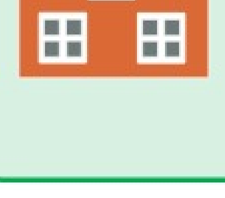

বাড়িতে বসে করো:

- তোমার বাড়িতে ও বাগানে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলির একটি তালিকা তৈরি করো। ওই পরিবর্তনগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি স্থায়ী বা অস্থায়ী বা প্রত্যাবর্তী বা অপ্রত্যাবর্তী, ভৌতিক বা রাসায়নিক তা একটি তালিকা তৈরি করে দেখাও।

সপ্তম অধ্যায়

জীব ও নির্জীব

স্কুল ছুটির অবকাশে তুমি নানা স্থানে বেড়াও। তেমনি বনভোজনের জন্যও অনেক জায়গায় যাও। তোমরা সেখানে কী কী দেখতে পাও? অনেক কিছু দেখতে পাবে। যেমন, সমুদ্র, নদী, পাহাড়, পর্বত, বিভিন ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ, গাড়ি, মোটর, অট্টালিকা ইত্যাদি। তুমি যা যা দেখলে সেগুলি কি সব একই ধরনের?

সব জিনিসের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোনোটা বড় তো কোনোটা ছোট, কোনোটা জীবিত তো কোনোটা মৃত। সবার আকৃতি, গঠন ও বংশ পৃথক পৃথক।

৭.১ জীব

তোমার দেখা কোন্‌গুলির মধ্যে জীবন আছে ও কোন্‌টির মধ্যে জীবন নেই? পিঁপড়া, ভেওপিপড়ে, কৃমি, আরশোলা, কুকুর, মুরগি, সাপ, গিরগিটি, টিয়া, কাক, নারকেল গাছ, আমগাছ, শশাগাছ ইত্যাদির জীবন আছে। গাড়ি, মোটর, বাসনকোসন, বই, কলম, রেডিও, সাইকেল ইত্যাদির জীবন নেই।

জীবন আছে

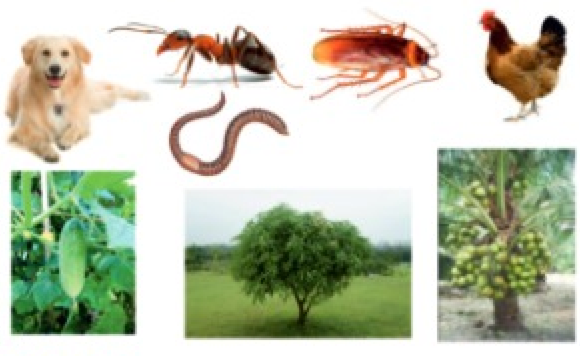

জীবন নেই

যার জীবন থাকে তাকে জীব বলা হয়। যার জীবন থাকে না সে নির্জীব।

তোমার বাড়িতে যেসব জিনিসপত্র দেখতে পাও সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করো। ওদের মধ্যে যেগুলি জীব ও যেগুলি নির্জীব তার একটি সারণী প্রস্তুত করো।

সারণী ৭.১ জীব ও নির্জীব

বস্তু	জীব	নির্জীব
গাই		
চৌকি		

এবার বলো, আমরা কীভাবে জানব কে জীব, কে নির্জীব। কখনও কখনও তা এত সহজে জানা যায় না। জীবদের কিছু বিশেষত্ব থাকে ও তারা নির্জীবদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আচ্ছা বলো তো, আমরা আমাদের কেন জীব বলি? কী কারণে আমরা নির্জীবদের থেকে পৃথক? সেই কারণগুলি অর্থাৎ যে গুণের অধিকারী হওয়ায়, আমরা নির্জীবদের থেকে আলাদা, সেগুলো আলোচনা করা যাক—

৭.২ জীবের চলনশক্তি

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, জল, বায়ু আবশ্যক ও সেজন্য তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়। কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তারা প্রত্যক্ষ চলনশক্তিহীন। তবে কিছু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যথা:

শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া স্থান পরিবর্তন করতে পারে।

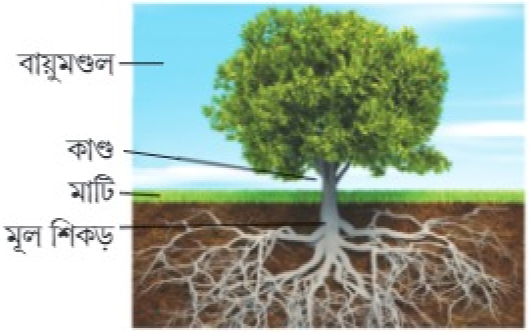

চিত্র ৭.১ উদ্ভিদের অঙ্গচালনা

তেমনই উদ্ভিদের অঙ্গ যথা: মূল শিকড় মাধ্যাকর্ষণের ফলে মাটির দিকে ও কাণ্ড আলোর দিকে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

৭.৩ জীবের প্রয়োজন খাদ্য

প্রত্যেক প্রাণীর জীবনধারণের জন্য খাদ্য আবশ্যক। খাদ্য যে প্রাণীকে শুধু যে শক্তি জোগায় তা নয় চলশক্তি ও বুদ্ধি বিকাশেও সাহায্য করে।

তোমার কাজ: ২

কিছু গুড় নাও, তা যদি বাইরে রেখে দাও তবে কী দেখবে? তা খাওয়ার জন্য পিঁপড়ে এসে জমবে। তুমি কী খেয়ে স্কুলে যাও? খেলার ছুটির সময় খিদে পায় কি? দুপুরে খাওয়ার পরে কেমন লাগে? এই আহার তোমাকে শক্তি দেয়।

৭.৪ প্রাণীর বৃদ্ধি

উদ্ভিদ শ্রেণীর জীব জল ও খনিজ লবণ দিয়ে নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রাণীরা তাদের খাদ্য সংগ্রাহের জন্য উদ্ভিদের উপরে নির্ভর করে।

চিত্র ৭.২ উদ্ভিদের বৃদ্ধি

তোমার ছেলেবেলার পোশাক এখন তুমি কি পরতে পারবে? কয়েক বছরের মধ্যে তোমার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়েছে। সব প্রাণীর ক্ষেত্রেও তাই হয়। কুকুরছানার বড় হওয়ার কথা তুমি জানো। বড় হতেও দেখেছ। উদ্ভিদরা কীভাবে বড় হয় তাও দেখেছ। এসব চিত্র ৭.২-তে দেখতে পাবে।

চিত্র ৭.৫ শ্বসন

তোমার কাজ: ৩

একটি বোতলে অল্প স্বচ্ছ চুনজল নাও। ওতে কিছু ভিজা গজামুগ নিয়ে একটি কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। এরপরে দেখো কী হয়। কিছু সময় পরে বোতলে স্বচ্ছ চুনের জল দুধের মতো রং হয়ে যাবে। আমরা প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের ভিতরে বাতাস গ্রহণ করি। বাতাস থেকে অম্লজান ব্যবহার করে আবার নিশ্বাসের মাধ্যমে অঙ্গারকাম্লযুক্ত বায়ু বাইরে ছাড়ি।

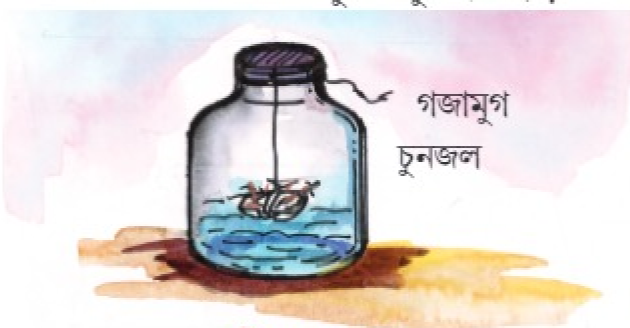

চিত্র ৭.৩ শ্বসন

নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে শ্বাসক্রিয়া বলে। শ্বাস ত্যাগের দ্বারা বেরিয়ে যাওয়া অঙ্গারকাম্ল চুনজলকে দুধের মতো সাদা করে দেয়। এভাবেই সমস্ত প্রাণী শ্বাস গ্রহণ করে ও ছাড়ে। গজামুগের বদলে কেঁচ পাতলা কাপড়ে বেঁধে পরীক্ষা করো। কিছুক্ষণ পরে সেই পরিস্কার চুনজলের কী পরিবর্তন হয় দেখো।

৭.৬ জীবের রেচন

প্রাণী মাত্রেই খাদ্য খায়। খাবার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নেওয়ার পরে শরীরে কিছু বর্জ্যবস্তু সৃষ্টি হয়। যে প্রক্রিয়ায় শরীর এই অমূলক বস্তু শরীর থেকে বাইরে বের করে দেয় তাকে রেচন বলা হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা

মানুষের শরীর থেকে মল, মূত্র, ঘাম বেরিয়ে যায় তা তুমি দেখেছ। তেমনি উদ্ভিদের মধ্যে এই রেচন হয়। সজনে গাছের আঠা ওই গাছের শরীরে বেরোনো এক বর্জ্যবস্তু।

৭.৭ প্রাণীদের প্রতিক্রিয়া

খালি পায়ে হাঁটার সময় পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমরা কী করি? তেমনি সুস্বাদু খাবার খেয়ে আমরা কী অনুভব করি।

এরকম পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে আমাদের শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

তোমার কাজ: ৪

তোমার বাগানের একটা ছোট গাছের উপরে একটা মাটির হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দাও এবং হাঁড়ির একপাশে ছোট ফুটো করে দাও।

কিছুদিন অপেক্ষা করো। কী দেখলে? হাঁড়ির গাছটি ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কারণ গাছটি আলো পাওয়ার জন্য হাঁড়ির ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। এইভাবেই সকল প্রাণীর মধ্যেই প্রতিক্রিয়া থাকে।

চিত্র ৭.৪ উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া

৭.৮ প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি

তুমি জানো মুরগি ডিম দেয়। সেই ডিম ফোটার পরে মুরগির ছানা বেরোয়। বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীরাও বাচ্চার জন্ম দেয়। এই ভাবে প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি হয়।

চিত্র ৭.৫ প্রাণীর বংশবৃদ্ধি

তোমার কাজ: ৫

গোলাপ কিংবা জবাগাছের ডাল নাও। সেগুলো কেটে মাটিতে পুঁতে দাও। মাঝে মাঝে জল দাও। কিছুদিন অপেক্ষা করো। তারপর কী দেখবে?

চিত্র: ৭.৬ উদ্ভিদের বংশবিস্তার

অনেক ডাল থেকে শিকড় বেরোতে দেখবে। সেগুলো বাড়তে বাড়তে নতুন গাছ হয়ে যায়।

জীবজন্তুরা পৃথক পৃথক উপায়ে নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে কেউ ডিম দেয় কেউ বা বাচ্চার জন্ম দেয়। উদ্ভিদ যারা ভূমি ভেদ করে ওঠে তারা বীজ কিংবা গাছের অন্য অংশ থেকে নিজের বংশ বৃদ্ধি করে।

প্রাণীদের জীবনচক্র থাকে ও তা দু'টি পর্যায়ে সমাপ্ত হয়। প্রথমটি শারীরিক বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়টি হল প্রজনন বৃদ্ধি কাল। তোমার দেখা জীব ও নির্জীবের তালিকা করো তাদের এই প্রক্রিয়া হয় কি না তার একটি সারণী তৈরি করে তোমার খাতায় লেখো।

সারণী ৭.২ জীব ও নির্জীবদের মধ্যে দেখতে পাওয়া প্রক্রিয়া

নাম	চলন	বৃদ্ধি	খাদ্যগ্রহণ	শ্বাসক্রিয়া	রেচন	বংশবৃদ্ধি	প্রতিক্রিয়া
বিড়াল							
কাঠের বাক্স							

কী শিখলাম:

- আমাদের চারপাশে থাকা জিনিসগুলির মধ্যে কিছু সজীব ও কিছু নির্জীব।
- প্রাণী নিজের প্রয়োজনমতো চলাফেরা করে।
- প্রাণীরা বাড়তে পারে।
- শ্বাস প্রক্রিয়ায় জীব তার শরীরের ভিতরে বায়ু থেকে অম্লজান নিয়ে অঙ্গারকাম্ল ত্যাগ করে।
- রেচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণী শরীর থেকে বর্জ্যবস্তু বের করে দেয়।
- প্রাণীদের মধ্যে উদ্দীপনায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
- জীব নিজের বংশবিস্তার বিভিন্ন উপায়ে করে।

অভ্যাস

১. একটি পাথর ও বিড়ালের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

২. কুকুর ও আমগাছের মধ্যে দুটি সামঞ্জস্য ও দুটি পার্থক্য লেখো।

৩. প্রাণী পরিবেশের মধ্যে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে তোমার অনুভূতি থেকে তিনটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৪. আগুন কি জীব? তোমার উত্তরের যথার্থতা বোঝাও।

৫. শ্যাওলা জীব কি নির্জীব যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

বাড়িতে বসে করো:

- পত্রপত্রিকা থেকে প্রাণীদের ছবি সংগ্রহ করে একটি খাতায় আঠা দিয়ে লাগাও। তাদের লক্ষণ সম্বন্ধে একটি বা দুটি বাক্যে লেখো।

অষ্টম অধ্যায়

অবস্থান বা সংস্থা

তুমি তোমার গ্রাম কিংবা তোমার অঞ্চলের পুকুর বা গড়িয়া দেখেছ। জঙ্গলে অনেক জীব বাস করার কথা শুনেছ। আচ্ছা বলো তো, পুকুর, গড়িয়া ও জঙ্গলে কোন্ কোন্ জীব বাস করে?

চিত্র ৮.১ জলজন্তু ও উদ্ভিদ

পুকুর কিংবা ডোবায় বাস করা জীবদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে কোনগুলি উদ্ভিদ ও কারা প্রাণী চিহ্নিত করে সারণী করো।

সারণী ৮.১ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী

জীবের তালিকা	উদ্ভিদ	প্রাণী
মাছ		
বিলাতি দল		

৮.১ অবস্থান (Habitat) কী?

প্রত্যেক জীবের জীবজগতের এক জৈবিক একক পরিচিতি রয়েছে। জৈবিক পদার্থের সমাহারে তাদের শরীর গঠিত। সে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে বাস করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ে একই ধরনের মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত হলেও তাদের শরীরের গঠন ভিন্ন রকমের হয়।

এবার জানব, অবস্থান বলতে কী বোঝায়?

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বাসস্থান ও তার চারপাশকে সংস্থা বা অবস্থান বোঝায়। অবস্থান হচ্ছে পরিবেশের এক অবস্থা বিশেষ। ইহা ভিন্ন ভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত। বাসস্থান দুটি উপাদানে গঠিত। সেগুলি হল:

(ক) জৈবিক,

(খ) অজৈবিক।

তুমি দেখেছ পুকুর ও ডোবাতে এই দুটো উপাদানই পাওয়া যায়।

৮.২ জৈবিক

যে কোনো অবস্থানের জৈবিক উপাদানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) উৎপাদক ও সবুজ উদ্ভিদ, (২) ভক্ষক বা প্রাণী, (৩) অপঘটক বা কিছু জাতির মৃতভোজী অণুজীব। উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদরা নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। ভক্ষক দুই প্রকার। তৃণভোজী বা শাকাহারী এবং মাংসাশী।

অণুজীব অতি ক্ষুদ্র, খালি চোখে দেখা যায় না, অধিকাংশ অণুজীবের নিজের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করার ক্ষমতা থাকে না। তারা পরজীবী কিংবা মৃতভোজীভাবে তাদের আবাসস্থল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। বিশেষত মৃতভোজী অণুজীবরা জীব শরীর থেকে আবশ্যকীয় উপাদান গ্রহণ করে এবং চতুষ্পার্শ্বে যবক্ষরজান, অম্লজান ও অন্যান্য পোষক পদার্থ ত্যাগ করে। বৃক্ষলতাদি পুনরায় তা গ্রহণ করে নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশে ব্যবহার করে। এজন্য মৃতভোজী অণুজীবদের অপঘটক বলা হয়।

৮.৩ অজৈবিক

এক অবস্থানের সহায়ক অজৈবিক উপাদানগুলি হল আলো, তাপমাত্রা, জল, বায়ু, মৃত্তিকা, আগুন ইত্যাদি।

আমরা জানি সবুজ গাছপালা পুষ্টি সাধনের জন্য আলোর শক্তিকে খাদ্য বা রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তন করে। সেই খাদ্যের উপরে সমগ্র জীবজগৎ নির্ভরশীল। তেমনি আলোর তীব্রতা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, জল, বায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদির সমারোহে কোন্ অঞ্চল জঙ্গল হবে, কী শস্যশ্যামলা ভূমি হবে নাকি মরুভূমি হবে তা নির্ভর করে।

বলা হয়, মানুষের প্রথম বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন হল আগুন। মানুষ এই আগুনের সাহায্যে তার খাদ্য পদার্থ পুড়িয়ে খেতে শিখল। আবার জঙ্গলে আগুন লাগলে মুহূর্তের মধ্যে জনাকীর্ণ অঞ্চল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হাজার হাজার জাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়। কাজেই আগুনকে অজৈব পদার্থের শক্তি বলা যায়।

৮.৪ বিভিন্ন ধরনের পরিস্থান

তোমার কাজ: ২

একটি সপ্তফেণী জাতীয় গাছ এবং একটি বেলফুল গাছের টব নিয়ে এসো। তার পর মাটি থেকে উপরিস্থ গাছের অংশটি পলিথিন দিয়ে বেঁধে দাও। কিছুক্ষণ রোদে গাছদুটি রেখে দাও। দেখো কী হয়?

পলিথিনের ভিতরে ছোট ছোট জলবিন্দু দেখতে পাবে। দুটি বৃক্ষ শাখার ডগায় সমান জলবিন্দু দেখতে পাবে। সপ্তফেণী জাতীয় উদ্ভিদে কম জলের ফোঁটা লেগে থাকবে কিংবা না থাকতেও পারে। কারণ মরুভূমির উদ্ভিদের জন্য জল সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। সেজন্য ওই গাছের পত্রগুলি কাঁটা জাতীয় হয়। পাতার মতো মাংসল অংশ তার রূপান্তরিত কাণ্ড। তার মাধ্যমেও জল সংরক্ষণ করা যায়।

মরুভূমির উদ্ভিদ বিষয়ে জানার পরে বলতে পারো কি অন্যস্থানে উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে বেঁচে থাকে? কিছু আবার জলেও বাস করে। মাছের কথা তো জানো। তাহলে বলো মাছ জলে কীভাবে থাকে? মাছের শরীর জলে থাকার ক্ষেত্রে উপযুক্ত। তার শ্বাসক্রিয়া জলে স্বাভাবিক থাকে। বন্ধ হয় না। সেজন্য মাছ জলে বেঁচে থাকে। কিন্তু এই পৃথিবীর অধিকাংশ জীব স্থলভাগে বাস করে।এর কারণ কী?

পরিবেশের অবস্থা ও আবশ্যকীয় পদার্থের পরিমাণ অনুসারে অবস্থান সাধারণত দুই প্রকারের হয়।

(ক) স্থলীয় অবস্থান,

(খ) জলীয় অবস্থান

উদ্ভিদদের অবস্থান

অবস্থানে জলের পরিমাণ অনুসারে উদ্ভিদের জীবনশৈলী ও গঠনে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এখানে আলো, তাপমাত্রা, মাটি, বায়ু—এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

অবস্থিতি অনুসারে উদ্ভিদ তিন প্রকারের।যথা:

(ক) মরুভূমির জলশূন্য অঞ্চলের বা মরুভূমির মতো অঞ্চলের উদ্ভিদ

(খ) আর্দ্র ভূমিজ—স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে জন্মানো উদ্ভিদ

(গ) জলজ—জলাধিক্য অঞ্চলের উদ্ভিদ

প্রাণীদের অবস্থান

উদ্ভিদ শ্রেণীর মতো প্রাণীরাও কি অবস্থান অনুসারে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করে? হ্যাঁ। নিজের আচরণ, চালচলন, খাদ্য, জলের জোগান ও আলোর আবশ্যকতা অনুসারে প্রাণীদের মুখ্যত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল:

(ক) স্থলচর,

(খ) জলচর,

(গ) উভয়চর

স্থলচর প্রাণীরা পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থান করে। জঙ্গল, মরুভূমি, শ্যামলাঞ্চল, পার্বত্যাঞ্চল ইত্যাদি। তেমনি জলচর প্রাণীরা নদী, হ্রদ, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয়ে থাকে। উভচর প্রাণীদের জল ও স্থলভাগে বিচরণের জন্য সামর্থ্য থাকে।

তোমার জানা বিভিন্ন জীবদের সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করো। সেগুলি প্রদত্ত সারণী অনুসারে সাজিয়ে লেখো।

সারণী ৮.২ অবস্থান ও জীব

জলচর	মরুভূ	জঙ্গল	উভচর
মাছ	উট	ভালুক	ব্যাঙ

৮.৫ জীব ও তাদের উপযোজন (Adoptation)

জীবেরা যে স্থানে বাস করে সেই অঞ্চলের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারে। অর্থাৎ, এই স্থানের জলবায়ু, মাটি, তাপমাত্রা ও অন্যদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে। একে উপযোজন বলা হয়। এটা ওদের শরীরের কিছু বিশেষ গুণ বলা যেতে পারে। তুমি জানো মাছ, কাঁকড়া, তিমি, পদ্ম, গুগলি জলে থাকে। ঠিক সেইরকম কাক, পায়রা, বাদুড় আকাশে উড়তে পারে। উট, কীটপতঙ্গ এবং সপ্তফেণীর মতো কাঁটাজাতীয় গাছপালা মরুভূমিতে বেঁচে থাকে।

কচুরিপানা

৮.৬ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী

ক. জলজ উদ্ভিদ

কচুরিপানা, পদ্ম ইত্যাদি উদ্ভিদকে আমরা পুকুর, ডোবাতে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে কিছু ভাসমান অবস্থায় ও আর কিছু জলে ডুবে থাকে।

সেইসব উদ্ভিদদের দেহে অনেক বায়ু গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকে যার ফলে তারা জলে ভেসে থাকতে পারে।

খ. জলজ প্রাণী

যে সব প্রাণী জলের মধ্যে বাস করে তাদের আমরা জলজ প্রাণী বলি।

তাদের শারীরিক কাঠামোর বিশেষত্বের ফলে তারা জলে বাস করতে পারে। যেমন: মাছের ডানা জলে সাঁতার কাটতে, লেজ দিক বদলাতে ও ফুলকা জলের মধ্যে শ্বাসক্রিয়াতে সাহায্য করে।

৮.৭ মরুজ উদ্ভিদ ও প্রাণী

ক. মরুজ উদ্ভিদ

মরুভূমিতে জন্মানো সপ্তফেণী, নাগফেণী, খেজুর ইত্যাদি কাঁটাজাতীয় গাছপালাকে মরুজ উদ্ভিদ বলা হয়। যেসব গাছের প্রায় পাতা দেখা যায় না বা সেগুলো রূপান্তরিত হয়ে কাঁটাতে পরিণত হয়। ফলে তারা বায়ুমণ্ডলকে কম পরিমাণে জল দিতে পারে।

খ. মরুজ প্রাণী

উটকে মরুভূমির প্রাণী বলা হয়। ওদের গায়ে কোনো স্বেদগ্রন্থি থাকে না। নাকের ভিতরে যে লোম থাকে তার সাহায্যে মরুভূমির ধুলোবালি আটকে দেয়, ভিতরে ঢুকতে পারে না। উটের বর্তুলাকার বিশিষ্ট ক্ষুরাবিহীন মাংসল পায়ের সাহায্যে উত্তপ্ত মরুভূমির বালিতে হাঁটতে পারে।

৮.৮ লতাজাতীয় (দুর্বল) উদ্ভিদ

তুমি নিশ্চয়ই উচ্ছে, কুমড়ো, শসাগাছ দেখেছ! ওই গাছগুলোর কাণ্ড দুর্বল বলে অন্যের সহায়তায় বেড়ে উঠে। সেজন্য ওই সব লতানো গাছের কাণ্ডে আঁকড়ি (Tendril) থাকে।

চিত্র ৮.৬ লতাজাতীয় উদ্ভিদ

প্রত্যেক জীবের অবস্থান তার জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এর কিছু পরিবর্তন হলে পরিবেশের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এর কুপ্রভাব জীবজগতের উপরে পড়ে।

কী শিখলাম ?

- উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বাসস্থান ও তার চারপাশকে অবস্থান বলে।
- একটি অঞ্চলে নানা ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ থাকে।
- পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবের আকৃতিপ্রকৃতি ও কর্মাকর্মের পরিবর্তনকে উপযোজন বলা হয়।
- পৃথিবীতে অনেক ধরনের বসতি স্থান থাকলেও তাদের স্থল ও জল এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।
- ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জীব দেখা যায়।
- উদ্ভিদপ্রাণী ও অণুবীজদের নিয়ে ওই অঞ্চলের জীব সম্বন্ধীয় কার্যক্রম গঠিত হয়।
- মৃত্তিকা, শীলা, বায়ু, জল, আলো ও শক্তিকে নিয়ে ওই স্থানের অজৈব শিল্পোৎপাদন সম্পাদিত হয়।

অভ্যাস

১. একটি অথবা দুটি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) অবস্থান কাকে বলে ?

(খ) উদ্ভিদের উপযোজন আবশ্যক কেন হয় ?

(গ) তিনটি অজৈব কারকের নাম লেখো।

২. কারণ লেখো।

(ক) মাছকে জল থেকে আনলে সে মরে যায়।

(খ) ঘোড়া মরুভূমিতে থাকতে পারে না।

(গ) উচ্ছে গাছ সোজা দাঁড়াতে পারে না।

৩। যেটি ঠিক তার পাশে টিক (☑) চিহ্ন দাও।

(ক) শসাগাছের আঁকড়ি একে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।

(খ) মাছ লেজের সাহায্যে দিক পরিবর্তন করে।

(গ) খেজুর গাছ মরুভূমিতে জন্মায়।

(ঘ) উট এক জলজ উদ্ভিদ।

বাড়িতে বসে করো:

- বড় কাচের বোতলে মাছ এবং অনুরূপ কিছু প্রাণীর সঙ্গে শৈবাল দাম দিয়ে জলীয় আবাসস্থল তৈরি করো।
- বিভিন্ন অঞ্চলের জীবদের ছবি সংগ্রহ করে আঠা দিয়ে খাতায় সাঁটিয়ে দাও।

নবম অধ্যায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্য

বেঁচে থাকার জন্য বায়ু, জল, খাদ্য এরকম অনেক পদার্থের প্রয়োজন। খাদ্য প্রস্তুতি, জলপান, শ্বাসক্রিয়া রেচন ও প্রজনন ইত্যাদি কাজ করার শক্তি শরীরের মধ্যে রয়েছে। এইসব কাজের জন্য জীবদেহে বিভিন্ন অংশ রয়েছে। এই সব অংশের মাধ্যমে জীব সব কাজ করতে পারে। সমস্ত অংশের কাজের দ্বারাই শরীর বেঁচে থাকে।

৯.১ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

তোমার কাজ: ১

তোমার স্কুলের বাগান থেকে একটা ছোট অদরকারী গাছ তুলে আনো। তোলার সময় দেখবে তার শেকড় যেন ছিঁড়ে না যায়। গাছটি দেখে তার প্রত্যেক অংশের একটি চিত্র অঙ্কন করো ও এর প্রত্যেক অংশের নাম লেখো।

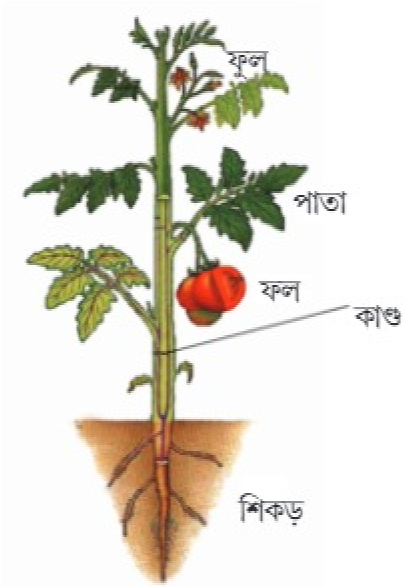

চিত্র: ৯.১ উদ্ভিদ

উদ্ভিদের গঠন ও তার কাজের মধ্যে মিল দেখতে পাওয়া যায়। এবার আমরা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব।

শিকড়:

উদ্ভিদের যে অংশ মূল থেকে অঙ্কুরিত হয়ে মাটির ভিতরে থাকে তাকে শিকড় বলা হয়। এটি আলোর বিপরীত দিকে (মাধ্যাকর্ষণের দিকে) মাটির দিকে বাড়তে থাকে। ৯.২ চিত্র দেখো ও শিকড়ের বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করো।

প্রধান মূল থেকে শাখামূল ও তা থেকে প্রশাখা সব বেরিয়ে মাটির ভিতরে বেড়ে উঠে এবং তা মাটির অনেক গভীরে গিয়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকে। ফলে গাছ মাটি থেকে জল সংগ্রহ করে বেশ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

মূল কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ:

মূলের মাথায় ছোট টুপির মতো এক অংশ থাকে। এটা মাটি থেকে ঘষা খেয়ে যাতে নষ্ট না হয়, তা রক্ষা করে। একে মূলত্রাণ বলে। মূলত্রাণের পরে কোষ বিভাজন ও তার পরের বেড়ে ওঠা অংশ মূলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তার পেছনের মূল থেকে অনেক শিকড় বেরোয়। এগুলো জল টেনে নিতে সাহায্য করে।

৯.২ উদ্ভিদের মূল

প্রত্যেক শাখা ও প্রশাখার মধ্যেও কোষ বিভাজন অংশ, গাছের গোড়া গজিয়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠার অংশ, মূল শিকড়ের অংশ থাকে।

৯.৩ মূলত্রাণ ও শিকড়

তোমার কাজ: ২

বটগাছের ঝুরি বা কেয়াগাছের শিকড় নিয়ে এসো। তেমনি জোগাড় করে তার মূলের চিত্র অঙ্কন করে ও তার বিভিন্ন অংশ নির্দেশ করো।

সব গাছের মূল এক ধরনের নয়। এর গঠন ও কাজ অনুসারে একে প্রধান মূল, গুচ্ছমূল ও রূপান্তরিত মূল বলা হয়।

উপরে উল্লেখ করা মূলের শ্রেণীবিভাগকে ভিত্তি করে কয়েকটি গাছের নাম লেখো ও আলোচনা করো।

চিত্র: ৯.৪ নানা প্রকারের মূল

চিত্র: ৯.৪-এ দেখানো মূল কি আগের চিত্রে দেখানো মূলের মতো? কিছু তফাত আছে কি? বটগাছের ঝুরি নেমে মাটির ভিতরে যায়। এর ফলে বটগাছ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। একে স্তম্ভমূল বলা হয়। কেয়াগাছ থেকে গজানো মূল ওই গাছে জড়িয়ে থাকে। ঠেস দিয়ে থাকে বলে একে ঠেসমূল বলা যায়। এই ধরনের মূল আর কোন্ গাছে রয়েছে তা লেখো। এ সমস্ত মূলকে আস্থানিক রূপান্তরিত মূল বলা হয়। তেমনি মূলা ও গাজরের ক্ষেত্রে প্রধান মূল রূপান্তরিত হয়ে ভণ্ডার মূল হয়।

মূলের কাজ

আমরা মূল বিষয়ে অনেক কিছু জানলাম। আচ্ছা, বলতে পারো মূল কী কী কাজ করে? তোমাদের মধ্যে আলোচনা করে মূলের কাজ সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করো।

(ক) মূল (শিকড়) গাছকে মাটিতে শক্ত করে ধরে থাকে।

খ) মাটিতে থাকা জল ও খনিজ লবণকে শোষণ করে গাছের বিভিন্ন অংশে পাঠায়।

(গ) রূপান্তরিত মূলগুলি খাবার সংগ্রহ করে ও কাণ্ডকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে।

কোন্ মূল আহার সংগ্রহ করে তার দুটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করো।

৯.২ উদ্ভিদের কাণ্ড

উদ্ভিদের যে অংশ তার বীজ থেকে বেরিয়ে মাটির উপরে বেড়ে ওঠে তাকে কাণ্ড বলে। উদ্ভিদের এই কাণ্ড বিষয়ে আরও কিছু জানা যাক।

তোমার কাজ: ৩

স্কুলের বাগানে যেসব গাছ রয়েছে তা দেখো এবং ওই সব গাছের নানা অংশ সম্পর্কে তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা করো। কাণ্ডের যে অংশ থেকে পাতা বেরোয় তাকে গাট বলে। দুটি গণ্ঠির মাঝের জায়গাটিকে পব বলে। গাটের যে স্থান থেকে পাতা বেরোয় সেখানের কাণ্ড ও পাতার মাঝের জায়গাটিকে কক্ষ বলে। এই কক্ষে কুঁড়ি বা মুকুল থাকে। এটি হল কক্ষ মুকুল। এই মুকুলগুলি শাখা, কাণ্ড ও ফুলে পরিণত হয়।

বাঁশ, বিশল্যকরণী, চাকুণ্ডা ও আখগাছের চিত্র তোমার খাতায় এঁকে তার পব, কক্ষ, গাট নির্দেশ করো। বিভিন্ন গাছের গণ্ঠি, পব ও কুঁড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করো।

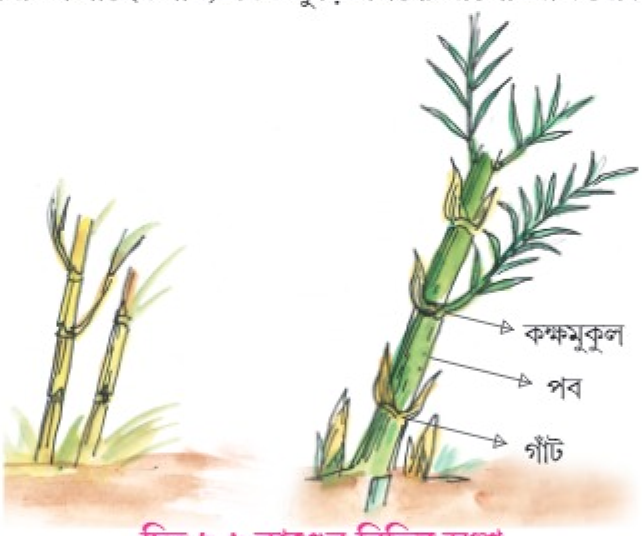

চিত্র ৯.৬ কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

তোমার কাজ: ৪

চিত্র ৯.৬ (ক) কুমড়ো গাছ

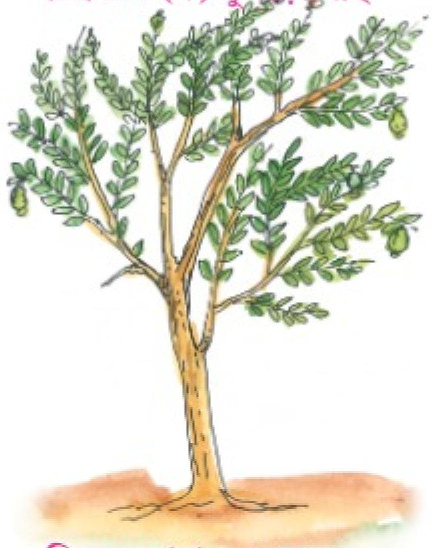

চিত্র ৯.৬ (খ) পেয়ারা গাছ

একটি কুমড়ো গাছ ও পেয়ারা গাছের কাণ্ড ভালোভাবে দেখো। দুটি গাছের কাণ্ডের ভিতরে যে পার্থক্য দেখছ লেখো।

কুমড়ো গাছের কাণ্ড অন্যের সাহায্য নিয়ে বেড়ে ওঠে কিন্তু পেয়ারা গছের কাণ্ড সাহায্য না নিয়ে বেড়ে যায়। গঠনের দিক দিয়ে বলা যায় কাণ্ড দুই ধরনের।

(ক) সবল কাণ্ড: আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাঁশ, বেগুন ইত্যাদি।

(খ) নরম কাণ্ড: কুমড়ো, পুঁই, উচ্ছে ইত্যাদি।

মূলের মতো কাণ্ডেরও রূপান্তর হয়। আদা, আলু, পেঁয়াজ ও ওল এক একটি রূপান্তরিত কাণ্ড। এগুলি রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে মাটির নীচে রয়ে যায়। সপ্তফেণী ও নাগফেণীর কাণ্ডও এই ধরনের।

কুমড়ো গাছের আঁকড়িগুলিও একটি রূপান্তরিত কাণ্ড।

লক্ষ করে দেখো, এগুলো পাতা থেকে বেরোয়। উচ্ছে, ঝিঙে, লাউ ইত্যাদি গাছে এই ধরনের কাণ্ড দেখতে পাবে। এগুলো গাছের উপরে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

চিত্র: ৯.৭ রূপান্তরিত কাণ্ড।

কাণ্ডের কাজ

তুমি গাছের কাণ্ড দেখেছ। এই কাণ্ডের কী কাজ তা জানো? উদ্ভিদের কাণ্ডের বিভিন্ন অংশকে ধরে রাখে ও এগুলি সূর্যের আলো সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। মূলের সাহায্যে শোষিত জল ও খনিজ লবণ কাণ্ড পরিবহন করে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেয়। কাণ্ডও পত্রের মাধ্যমে প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পাঠায়। কচু, ওল ইত্যাদি রূপান্তরিত কাণ্ড খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।

৯.৩ উদ্ভিদের পত্র

তোমরা গাছের কাণ্ডে থাকা পাতা দেখেছ। প্রায় সব গাছের ছোট কিংবা বড় পাতা থাকে।

তোমার কাজ: ৫

একটি জবা ফুলের পাতা নিয়ে তার চিত্র অঙ্কন করো। পাতার বিভিন্ন অংশগুলি চিনে নাও।

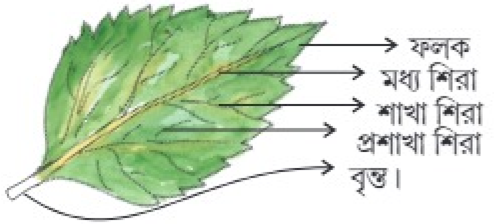

চিত্র: ৯.৮ পাতার বিভিন্ন অংশ

পাতার চওড়া অংশকে ফলক বলে। এটি বৃন্তের সঙ্গে লেগে থাকে। কখনও কখনও কিছু গাছের পাতায় বৃন্ত থাকে না। বৃন্তের উপস্থিতি অনুযায়ী পাতা দুই প্রকার।

(ক) বৃন্তসহ: যথা, আম ও কাঁঠাল গাছের পাতা।

(খ) বৃন্ত ছাড়া: যথা, রঙ্গনী গাছের পত্র।

সব পাতার ধার, আকৃতি, শিকড় বিন্যাস কি সমান? কিছু পাতা সংগ্রহ করে এগুলির তুলনা করো। পাতার বৃন্তের সামনে এক বা একাধিক শিরা বেরিয়ে সারা ফলকে ছড়িয়ে থাকে। আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের ফলক একটি। কিন্তু শিম, নিম, সজনে ইত্যাদি গাছের পাতার ফলকগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। এগুলিকে পত্রক বলা হয়।

তোমার কাজ: ৬

তুমি বেল, শিম, নিম, কৃষ্ণচূড়া ও সজনে গাছের একেকটি ডাল এনে পাতাগুলি ভালো করে দেখো। তোমার খাতায় এদের চিত্র অঙ্কন করো।

প্রতিটি পত্রকেও ছোট ছোট বোঁটা থাকে। অনেক সময় পত্রকটি পাতার মতো দেখা গেলেও তা পাতা নয়। পালকের একটি অংশ মাত্র। এই রকম পত্রক থাকা পাতাকে যৌগিক পত্র বলা হয়। কিন্তু আম, কাঁঠাল ও পেঁপে ইত্যাদির পাতাকে মৌলিক পত্র বলে।

চিত্র ৯.৯ বিভিন্ন ধরনের পত্র

আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি পাতার ধার কাটা-কাটা নয়। কিন্তু জবা ফুলের পাতা কাটা-কাটা, পেঁপে গাছের পাতাও অনেক কাটা-কাটা ধরনের হয়। তেমনি বিভিন্ন পাতার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখো। অশ্বত্থ পাতার সামনেটা সরু কিন্তু কাঁঠাল পাতার সামনেটা সরু নয়। অনেক জাতীয় পাতার সামনেটা কিছু পরিমাণে সরু হলেও কাঞ্চন বৃক্ষের পাতা দেখলে মনে হয় তা যেন ভিতরের দিকে গেছে। চিত্র ৯.১০ দেখো।

চিত্র ৯.১০ বিভিন্ন পত্র

বিভিন্ন ধরনের পাতার মাঝে এক একটি মোটা শিরা থাকে এবং সেখান থেকে শাখা ও প্রশাখা শিরাগুলি বেরোয়। দুটি শাখা শিরা থেকে বেরোনো দুটি প্রশাখা শিরা পরস্পর মিলে পাতার মধ্যে জালের মতো বিছিয়ে পড়ায় তাকে জালি শিরাবিন্যাস বলা হয়।

বটগাছের পাতার দিকে তাকাও। কিন্তু ধান ও কলার শিরা সমান্তর হলেও পার্থক্য রয়েছে। (চিত্র ৯.১১) পাতার

বৃন্তের সামনে থেকে কিছু শিরা বেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। এই শিরাগুলি সমান ছিল বলে মনে হচ্ছে। কোনো শিরা থেকে শাখাশিরা বেরোয়নি। এই প্রকার শিরার বিন্যাসকে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বলা হয়।

চিত্র ৯.১১ পাতার শিরাবিন্যাস

পাতার কাজ:

পত্র উদ্ভিদের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। পত্র আলোর শক্তিকে ব্যবহার করে খাদ্য প্রস্তুত করে ও অম্লজান নিষ্কাশিত করে। এই খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সমস্ত জীবজগৎকে খাদ্য প্রদান করে। পাতার মধ্যে থাকা অসংখ্য ছিদ্র দ্বারা উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে অম্লজান নিয়ে অঙ্গারকাম্ল ত্যাগ করে শ্বসন করে। এই ছিদ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদ শরীর থেকে অত্যধিক জলকে জলীয় বাষ্প আকারে বাইরে ছাড়ে। একে উৎসাদন বলা হয়।

৯.৪ ফুল:

ফুল উদ্ভিদের এক প্রধান অংশ। ফুল থেকে ফল জন্মায়। ফুল তুমি কী কী কাজে ব্যবহার করো তা আলোচনা করে লেখো।

তোমার কাজ: ৭

একটি কৃষ্ণচূড়া ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখে একটি চিত্র আঁকো ও এর বিভিন্ন অংশ নির্দেশ করো।

চিত্র ৯.১২ ফুলের বিভিন্ন অংশ

কৃষ্ণচূড়া ফুলের একটি বৃন্ত। বৃন্ত ছাড়া ফুলের আরও চারটি অংশ আছে। বলো তো দেখি, সেগুলি কী? সেগুলো হচ্ছে: বৃত্তি, দল বা পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর।

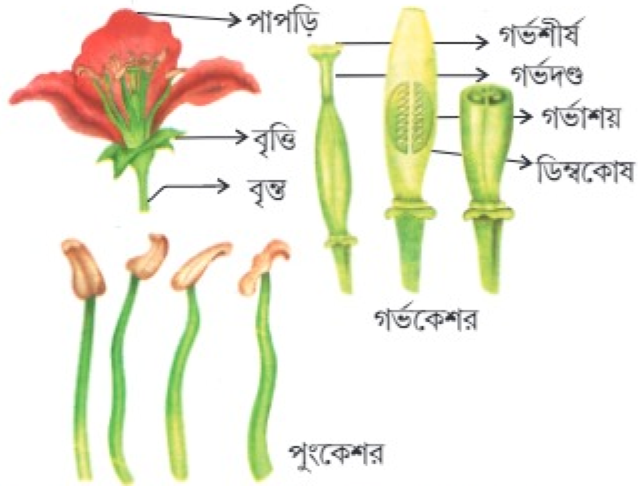

চিত্র ৯.১৩ পুংকেশর ও গর্ভকেশরের বিভিন্ন অংশ

একটি কৃষ্ণচূড়া ফুলের ভিতরে থাকে গর্ভচক্র। এটি একটি গর্ভকেশর নিয়ে গঠিত। গর্ভচক্রকে ঘিরে রয়েছে পুংকেশর চক্র। এতে দশটি পুংকেশর আছে। পুংকেশর চক্রে চারদিকে দলচক্র ঘিরে রয়েছে। এতে প্রায় ৫টি দল বা পাপড়ি অছে। পাপড়িগুলি রঙিন হয়। দলচক্রকে ঘিরে রয়েছে বৃত্তি চক্র। এতে রয়েছে ৫টি বৃত্তি।

ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে তখন তার গোলাকৃতি রূপ বাইরে থেকে দেখা যায়। কুড়ি যখন বড় হয় তখন তার গোলাকার রূপকে দলচক্র বলে । ফুল ফুটলে আরও দুটি আকৃতি স্পষ্ট দেখা যায় তৃতীয়চক্র হল পুংকেশর ও গর্ভকেশর গোলাকৃতিকে চতুর্থচক্র বলে।

ফুলের কাজ:

ফুলের প্রত্যেক পুংকেশরে একটি দণ্ড ও তার মুখাগ্রে একটি পরাগকেশর থাকে। পরাগকেশরে পুষ্পরেণুতে পূর্ণ থাকে। প্রতি গর্ভকেশরের ডগায় গর্ভশীর্ষ, মাঝে গর্ভদণ্ড এবং নিম্নভাগে গর্ভাশয় থাকে। পূর্ণতা প্রাপ্ত পরাগ গর্ভশীর্ষে পৌঁছলে পরাগ সঙ্গম হয়। পরাগ সঙ্গমের কিছুদিন পরে গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয়। গর্ভাশয়ের মধ্যে একটি বা অনেক ডিম্বকোষ তৈরি হয়।

ফল থেকে এগুলি আবার বীজে পরিণত হয়।

কুমড়ো, উচ্ছে ইত্যাদি গাছের কিছু ফুলে গর্ভকেশর থাকে না আবার কিছু ফুলে পুষ্পরেণু থাকে না। তাই সেগুলোকে যথাক্রমে নিষ্ফলা ও ফলন্ত বলা হয়। অর্থাৎ গাছে দুই প্রকার ফুল ফোটে। কিন্তু অন্য আর এক ধরনের গাছে শুধুমাত্র এক ধরনের ফুল ফুটে তাদের নিষ্ফলা আবার ফলন্ত গাছও বলা হয়। যথা: পটল, কাঁকরোল, তাল, খেজুর।

কী শিখলাম ?

- উৎপাদক হিসাবে উদ্ভিদ জীবজগৎকে খাদ্য বিতরণ করে।
- উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে নিজেকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে আঁকড়ে রাখে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জল ও খনিজ লবণও শোষণ করে নেয়।
- কাণ্ড উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশকে ধরে রাখে। খাদ্য ও জল পাঠানো ছাড়াও গাছের পাতায় সূর্যের আলো গ্রহণ করতেও সাহায্য করে।
- পাতার সাহায্যে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত হয়।
- ফুল ও ফলকে উদ্ভিদের জন্মদাতা বলা হয়।
- ফল ও ফলের ভিতরের বীজ বংশবিস্তারে সাহায্য করে।

অভ্যাস

১. ধান ও কলাপাতা ছাড়া অন্য যে পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস রয়েছে তার মধ্যে দুটির চিত্র অঙ্কন করো।২. মূলের গঠন ও কাজের চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৩. কাণ্ড কত প্রকার এবং তা উদ্ভিদের কী কী কাজ করে বর্ণনা করো।

৪. দুটি মৌলিক ও দুটি যৌগিক পত্রের নাম লেখো।

৫. যে গাছের মূল গুচ্ছমূল হয় তার শিরাবিন্যাস কেমন হতে পারে পর্যবেক্ষণ করে বলো।

বাড়িতে বসে করো:

নিম্নোক্ত প্রত্যেক প্রশ্নের দুটি করে পত্র সংগ্রহ করে খাতায় সাঁটো।

- সমান্তরাল শিরাবিন্যাস ও জালি শিরাবিন্যাস
- সবৃন্তক পত্র ও অবৃন্তক পত্র
- মৌলিক পত্র ও যৌগিক পত্র

দশম অধ্যায়

দৈর্ঘ্য ও দূরত্বের মাপ

তোমার জীবনের অনেক পরিস্থিতিতে দৈর্ঘ্য ও দূরত্বের হিসাব বিষয়ে হয়তো তোমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

- তোমার শার্টের জন্য কত দৈর্ঘ্যের কাপড় লাগবে তা দরজি ফিতা দিয়ে মেপে বলে।
- কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে জামার জন্য আড়াই মিটার লম্বা কাপড় চাইলে সে মিটার দিয়ে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাপড় মেপে তা কেটে দেয়।
- একজন কাঠের মিস্ত্রি কাঠের টেবিল তৈরি করার সময় তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা বিষয়ে জেনে টেবিলের জন্য কত কাঠ লাগবে তার হিসাব করো।
- কোনো জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে তার যথার্থ পরিমাণ জমি জানার জন্য আমিন চেন ও কড়ি ব্যবহার করে।

ভুবনেশ্বর থেকে কটক যাওয়ার জন্য যত টাকা ট্যাক্সি ভাড়া লাগে, ভুবনেশ্বর থেকে পুরী যেতে হলে তার চেয়ে বেশি ভাড়া দিতে হয়। দুটি শহরের দূরত্বের উপরে এই দর নির্ভর করে।

তোমার দেখা অন্য পরিস্থিতির যেখানে দৈর্ঘ্য বা দূরত্বের পরিমাপ নির্ধারণ করা দরকার হয়, তার একটি তালিকা তৈরি করো। অন্যদের সঙ্গে তোমার অনুভূতি বিষয়ে আলোচনা করো।

১০.১ দৈর্ঘ্য ও দূরত্ব মাপার আবশ্যকতা

উপরে আলোচনা থেকে বলো—

(ক) দরজি মাপ না নিয়ে শার্টের জন্য কত কাপড় দরকার তা বলতে পারবে কি?

(খ) কাপড় ব্যবসায়ী মাপের সাহায্য না নিয়ে শার্টের জন্য নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাপড় দিতে পারবে কি?

(গ) না মেপে কাঠের মিস্ত্রি টেবিলের জন্য কত কাঠ লাগবে তার হিসাব সে কি দিতে পারবে?

(ঘ) চেন ও কড়ির সাহায্যে না মেপে আমিন জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত তা কী করে বলতে পারবে?

(ঙ) দুটি শহরের মধ্যে দূরত্ব না জেনে ট্যাক্সি ড্রাইভার তার যথোচিত ভাড়া চাইতে পারে কি?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে আমাদের জীবনে দৈর্ঘ্য ও দূরত্ব জানার আবশ্যকতা আছে।

তুমি হয়তো তোমার বাড়ি থেকে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাও। কারণ তোমার বাড়ি থেকে স্কুল খুব কম সময়ের রাস্তা। কিন্তু ভুবনেশ্বরে তোমার সমবয়সি ছাত্র তার সাইকেল বা তার বাবার সঙ্গে গাড়িতে স্কুল যায়। কারণ ওদের স্কুল ওদের বাড়ি থেকে অল্প রাস্তা নয়। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব হয়ত ২-৩ কিলোমিটার।

ঠিক সেই রকম নতুন দিল্লিতে প্রায় প্রত্যেক ছাত্র তাদের স্কুল বাসে কিংবা গাড়িতে যায়। কারণ সেখানে বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রে ১০-১৫ কিলোমিটার।

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে অনেক সময় আমাদের জীবনশৈলী ও তৎসংক্রান্ত নিষ্পত্তি আমাদের দূরত্বের ধারণার উপরে নির্ভর করে।

১০.২ দৈর্ঘ্য ও দূরত্ব

নিম্নোক্ত প্রশ্ন দুটি লক্ষ্য করো।

১. ● তোমার উচ্চতা কত?
   ● তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দূরত্ব কত?

২. ● তোমার ক্লাসরুমের দৈর্ঘ্য কত?
   ● তোমার শ্রেণীকক্ষের লম্বা দিকের দুটি দেওয়ালের মধ্যে ব্যবধান (দূরত্ব) কত?

৩. ● তোমার রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লি ট্রেনে গেলে তার দূরত্ব কত?

● তোমার রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লি পর্যন্ত রেললাইনের দূরত্ব কত?

লক্ষ্য করো, উপরের প্রশ্ন যুগলের মধ্যে 'দৈর্ঘ্য' ও 'দূরত্ব' শব্দের অর্থ কিন্তু একই। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, একটি বস্তুর দুটি বিন্দুর মাঝখানের ব্যবধানকে 'দৈর্ঘ্য' বলা হয় ও পৃথিবীপৃষ্ঠের দুই বিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধান তাকে দূরত্ব বলা হয়।

এবার দেখো, আমরা দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব কীভাবে মাপা যায় তা জেনে নেব।

10.3 মাপক

তোমরা ক্লাসরুমে বসার সময় কখনও কখনও তোমাদের মধ্যে বেঞ্চে কেউ বেশি জায়গা নিয়েছে বলে ঝগড়া হয়। তা কিন্তু মাস্টারমশাই জানতে পারেন। মাস্টারমশাই তোমাকে তোমার হাতে মেপে তার সমাধান করতে বলেন। তুমি এবার তোমার বেঞ্চটি হাত মেপে দু'ভাগ করো। যদি তোমার হাতে মাপার পরে কিছু অংশ বাড়তি রয়ে যায়, তার মীমাংসা কীভাবে করবে?

তোমার কাজ: ১

এবার তুমি একটি সুতলি নিয়ে বেঞ্চের দৈর্ঘ্যের দিকে রাখো। এই সুতলি যেখানে বেঞ্চের মাথার দুদিকে থাকছে সেখানে দুটো গিঁট দাও। এই সুতলি থেকে কম দূরত্বকে কীভাবে মাপবে? সুতলির দুটি গিঁটের মাঝের অংশটি ঠিক করো। সুতলিটি দৈর্ঘ্যের দিকে রেখে (যেখানে সুতলির মাঝের অংশটি ঠিক রেখেছে) বেঞ্চের উপরে একটি চিহ্ন দাও। সেখানে প্রস্থের দিকে একটি দাগ টেনে বেঞ্চটি সমান দু'ভাগে বিভক্ত করে দাও। এবার আর জায়গা বেশি নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

তেমনিভাবে এই বেঞ্চের এক-চতুর্থাংশ এবং এক-অষ্টমাংশ নিজে নির্ণয় করো। এবার এই সুতলি দিয়ে বেঞ্চের দৈর্ঘ্যকে সমান তিনভাগে ভাগ করতে পারবে তো?

এছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এই বেঞ্চটি তুমি কি সমান দুভাগে ভাগ করতে পারো? অবশ্য তুমি জ্যামিতি বাক্স থেকে স্কেল নিয়ে তার দৈর্ঘ্য মেপে দু'ভাগ করতে পারবে। কিন্তু অতীতে লোকেরা কী করে নানাভাবে দৈর্ঘ্য মাপত, এসো তা জেনে নিই।

তোমার কাজ: ২

তোমার নিজের পায়ের মাপ অনুসারে শ্রেণীঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপো, নীচের সারণীটি খাতায় এঁকে তা পূরণ করো। এভাবে মাপার সময় দেখবে শেষের দিকে কিছু অংশ তোমার পায়ের মাপ থেকে কম হয়ে বেড়ে থাকছে। এবার আগে সুতলির সাহায্যে যেভাবে বিভিন্ন অংশ মেপে বের করতে তেমনি বাড়তি অংশটির পরিমাণ কত তা সুতলির সাহায্যে নির্ণয় করো।

চিত্র ১০.১ পায়ের সাহায্যে দৈর্ঘ্যের মাপ

সারণী ১০.১ শ্রেণীগৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ

ছাত্রছাত্রীর নাম	শ্রেণীগৃহের দৈর্ঘ্য (পায়ের মাপে)	শ্রেণীগৃহের প্রস্থ (পায়ের মাপে)

তোমার কাজ: ৩

তুমি নিজের হাতের একবিঘৎ করে শ্রেণীগৃহের টেবিলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপো এবং আগের মতো নীচের সারণী তোমার খাতায় তৈরি করে পূরণ করো। এখানেও আগের মতো তোমার একবিঘৎ মাপের সুতলি নিয়ে তা থেকে কমে যাওয়া অংশের পরিমাপ কত হচ্ছে তা দেখো।

চিত্র ১০.২ একবিঘৎ মাপ

সারণী ১০.২ টেবিলের একবিঘৎ অংশের মাপ।

ছাত্রছাত্রীর নাম	টেবিলের দৈর্ঘ্য (একবিঘৎর মাপে)	টেবিলের প্রস্থ (একবিঘৎর মাপে)

এ থেকে তুমি কী জানলে? তোমার পায়ের মাপে শ্রেণীগৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপেছিলে। সবার মাপ কি সমান হয়েছে? তেমনি হাতের একবিঘৎ মাপে শ্রেণীঘরের টেবিলের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মাপও সমান হবে না। এর কারণ কী জানো?

যেহেতু তোমার পা ও হাতের বিঘৎর সঙ্গে তোমার পা ও বিত্তার দৈর্ঘ্য সমান নয় সেজন্য এরকম হয়। তাই কোনো ভৌতিক পরিমাপের জন্য এরূপ পা ও বিঘৎ ব্যবহৃত হলে সেই মাপকে অন্যেরা গ্রহণ করবে না।

তবে অতীতে পায়ের দৈর্ঘ্য এবং হাত ও একবিঘৎ করে স্থানের দূরত্ব মাপা হত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সিন্ধু সভ্যতার যুগে লোকেরা এই প্রকার মাপের প্রণালী বিষয়ে অবগত ছিল। ফলত ওদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধরনের।

ইজিপ্টের লোকেরা অতীতে তেমনি হাতের (কনুই থেকে আঙুলের শেষ পর্যন্ত) সাহায্যে দূরত্বের পরিমাপ নির্ণয় করত। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে এমনি নানাভাবে পরিমাপের প্রথা ব্যবহৃত হত। আমাদের দেশেও হাতের আঙুল এবং মুঠোর দ্বারা দূরত্ব নির্ণয় করা হত। প্রত্যেক লোকের হাত, পা ও মুঠোর দৈর্ঘ্য সমান না হওয়ার দরুন সকলের সে মাপ গ্রহণযোগ্য হয় না বরং এ রীতি সকলের কাছে বিভ্রান্তিকর।

সেজন্য একটি গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি অনুসরণ করা দরকার।

এ থেকে তুমি জানলে যে, মাপন হল একটি পরিচিত রাশির সঙ্গে অন্য রাশির তুলনা। এই পরিচিত রাশিকে এককরূপে নেওয়া হয়। মাপের ফলাফল যে ভৌতিক রাশিতে প্রকাশ করা যায়, তার দুটি অংশ। তার মধ্যে একটি সংখ্যা ও অন্যটি তার একক। মাপের ফলাফলকে কেবল সংখ্যা বা এককে প্রকাশ করা অর্থহীন। উদাহরণস্বরূপ তোমার শ্রেণীগৃহের দৈর্ঘ্য তোমার পায়ের মাপে ২০ পা হলে, ২০ হচ্ছে সংখ্যা এবং পাদ (বা পা) তার একক।

১০.৪ আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি

এর আগের আলোচনায় তুমি জেনেছ যে, পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট ভৌতিক সংখ্যার মাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন একক ব্যবহার হত। তা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বাধা হয়ে দাঁড়াল। কাজেই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা একই প্রকার মানদণ্ডের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। একে আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি বলা হয়। এই আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একককে এক মিটার বলে ধরা হয়েছে। এক মিটার স্কেলের চিত্র নীচে দেওয়া হল।

চিত্র ১০.৩ মিটার স্কেল

এক মিটারের স্কেল নিয়ে পরীক্ষা করো। এটি ১০০ ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগ এক সেন্টিমিটারের। এক সেন্টিমিটার কত ভাগে বিভক্ত জানো? তা দশ ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে এক মিলিমিটার বলা হয়। অতএব ১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার (সেমি), ১ সেমি = ১০ মিলিমিটার (মিলি)। সাধারণত দূরত্ব মাপবার বৃহত্তর একক হচ্ছে কিলোমিটার। এক কিলোমিটার বলতে কত মিটার বোঝায় বলো তো? ১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার।

তোমার কাজ: ৪

তোমার জ্যামিতি বাক্সের স্কেলটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? এই স্কেলের প্রথম দিকে কত সূচিত হয়েছে? এই শূন্যচিহ্ন থেকে ১ (এক) প্রদর্শিত দাগ পর্যন্ত দূরত্ব ১ সেমি। তেমনি একটি মাপার ফিতা দেখে এর দুটি পাশাপাশি দাগের দৈর্ঘ্য কত তা এই স্কেল দিয়ে মেপে দেখো।

উদাহরণ দেখে নীচের সারণী পূরণ করো।

সারণী ১০.৩ মিটার স্কেলে একক পরিবর্তন।

১ মিটার	=	১০০ সেমি	
২ মিটার	=		সেমি
২৯ মিটার	=		সেমি
২ মিটার ২৫ সেমি	=	মি.	সেমি
১০০ সেমি	=	১ মিটার	
৫০০ সেমি	=	মিটার	
৩৪০০ সেমি	=	মি.	সেমি
৪০২৭ সেমি	=	মি.	সেমি

১০.৫ মাপার সময় সতর্কতা

দৈর্ঘ্য মাপার সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

- স্কেলের শীর্ষভাগ যেন বস্তুর অগ্রভাগের সঙ্গে ঠিকভাগে মিশে থাকে নচেৎ ঠিক মাপের হিসাবে ভুল রয়ে যাবে। নীচের চিত্র নং ১০.৪ লক্ষ্য করো।

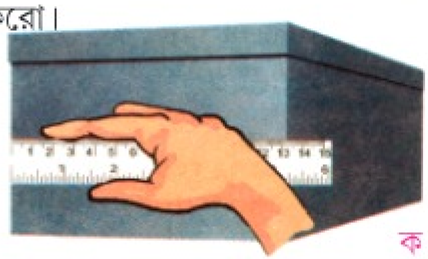

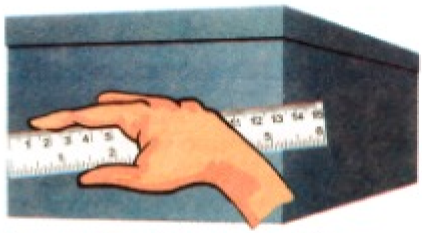

চিত্র ১০.৪ দৈর্ঘ্য মাপার প্রণালী

চিত্র ১০.৪ (ক) ও (খ) চিত্রে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য স্কেলটি বস্তুর সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে চিত্র ১০.৪ (ক) টি ঠিক মাপন প্রণালী। চিত্র (ক) দেখে বস্তুটির দৈর্ঘ্য কত বলো? চিত্র (খ) দেখে বস্তুটির দৈর্ঘ্য কত বলো?

- আমরা এর আগে আলোচনা করেছি, স্কেলের অগ্রভাগে শূন্য থাকে। তবে অনেক সময় বারবার ব্যবহারের ফলে স্কেলের অগ্রভাগের মাথার দাগ মুছে যায় কিংবা ঠিক দেখা যায় না। এ ব্যাপারে স্কেল ব্যবহারের সময় বিশেষ নজর দেওয়া আবশ্যক।

তুমি ভাঙা অংশ দিয়ে পরিমাপ নির্ধারণের জন্য চিহ্নবিন্দু আরম্ভ কোরো না। স্পষ্ট দেখা যায়, এমন চিহ্ন থেকে মাপতে শুরু করবে তাহলে সেই বস্তুর দৈর্ঘ্য কত?

- দৈর্ঘ্য মাপার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। ১০.৫ নং চিত্র দেখো।

দৈর্ঘ্য মাপার সময় চোখের দৃষ্টি যথাস্থানে না থাকলে মাপার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিত্র নং ১০.৫ দৈর্ঘ্য মাপার উপায়

উপরের চিত্র দেখে বলো চোখের কোন্ অবস্থানটি ঠিক অবস্থান? দৈর্ঘ্য মাপার সময় যে বিন্দুর মাপ নেবে ভূমিস্থিত সেই বিন্দুর ওপরে চোখ থাকা উচিত।

তোমার কাজ: ৫

তোমার ক্লাসে সবচেয়ে লম্বা ছেলেকে ডাকো। তোমাদের মধ্যে ৫ জন প্রত্যেকের উচ্চতা নিজের হাতে মাপো ও পরে স্কেলে মাপো। নীচের সারণীটি পূরণ করো।

সারণী ১০.৪ শ্রেণীর ছেলেদের উচ্চতা

যার উচ্চতা মাপা হবে সেই ছাত্রের নাম	হাত দিয়ে মাপো তার উচ্চতা	সেমি এককরে তার উচ্চতা

বিভিন্ন ছাত্রের উচ্চতা মাপার পর তুমি দেখবে, সকলের তৃতীয় ঘরের মাপ প্রায় সমান। কিন্তু সকলের মাপন পুরোপুরি সমান না হওয়ার কারণ কী? কারণ মাপার সময় কিছু ভুল থেকে যায়। এসব বিষয় তুমি উঁচু ক্লাসে গিয়ে পড়বে।

১০.৬ বক্ররেখার দৈর্ঘ্য সমান

তোমার কাজ: ৫

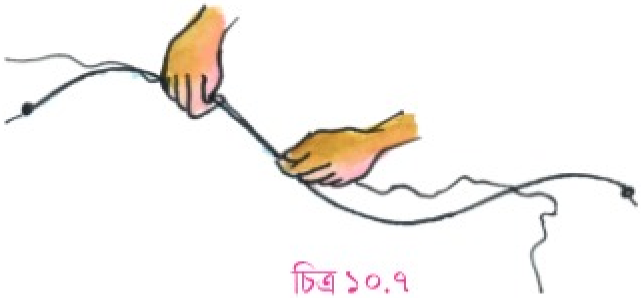

চিত্র ১০.৭

চিত্রে দেখানো বক্ররেখার দৈর্ঘ্য তুমি কীভাবে মাপবে? তুমি কি জ্যামিতি বাক্সের স্কেল দিয়ে তা মাপতে পারবে? না, কখনও স্কেল দিয়ে এই বক্ররেখাকে মাপতে পারবে না। তুমি কিন্তু সুতো দিয়ে এই বক্ররেখার দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে।

সুতোর একদিকে গিঁট দাও। এই গিঁটটি চিত্রের 'ক' স্থানে রাখো। সুতোর কিছু অংশ তোমার দুই হাতের সাহায্যে বক্ররেখার উপরে রাখো। এবং এই শেষ অংশটি হাতে ধরে অন্য হাতে সুতোর আরও কিছু অংশ বক্ররেখার উপরে রাখো। এইভাবে মেপে যাও। শেষে 'খ' বিন্দুর কাছে গিয়ে বক্ররেখার 'খ' বিন্দুকে সতোর বা অংশটি স্পর্শ করছে, সুতোর সেই অংশটি চিহ্নিত করো। এরপর বক্ররেখার উপর থেকে সুতোটি এনে স্কেল দিয়ে ওই সুতোটি মাপো। এখন বক্ররেখার প্রকৃত দৈর্ঘ্য জানতে পারবে।

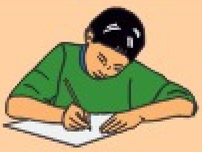

কী শিখলাম?

- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দৈর্ঘ্য ও দূরত্বের মাপন আবশ্যকতা অনেক।
- মাপন অর্থ একটি জানা সংখ্যার সঙ্গে অন্য না-জানা সংখ্যার তুলনা করা। এই জানা সংখ্যাটিকে একক রূপে নেওয়া যায়।
- মাপনের ফলাফল যে ভৌতিক রাশিতে প্রকাশ করা যায় তার দুটি অংশ থাকে। তন্মধ্যে একটি সংখ্যা ও অন্যটি তার একক।
- পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা একই প্রকার মানদণ্ডের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাকে আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এই আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতির দৈর্ঘ্যের একক হল মিটার।

অভ্যাস

১. উত্তর দাও।

(ক) একটি কুয়োর গভীরতা ও তার জলের গভীরতা কীভাবে মাপবে?

(খ) গাছের গণ্ডির গোলাকৃতি কীভাবে মাপবে?

(গ) একটি উত্তপ্ত পিনের দৈর্ঘ্য কীভাবে মাপবে?

(ঘ) তোমার পাকা স্কুলঘরের উচ্চতা কীভাবে মাপবে?

২. নীচের উক্তিগুলি ঠিক কি ভুল লেখো।

(ক) দুটি শহরের মধ্যে দূরত্ব মিটার এককে নির্দেশ করা যায়।

(খ) 'মানক মাপের' আবশ্যকতা নেই।

(গ) মাপার সময় চোখ মাপন বিন্দুর সোজাসুজি থাকা আবশ্যক।

৩. নীচে দেওয়া দৈর্ঘ্যের একককে বড় থেকে ছোটক্রমে সাজিয়ে লেখো। সেন্টিমিটার, মিলিমিটার, কিলোমিটার, ডেসিমিটার।

৪. দরজির ব্যবহৃত মাপফিতা এবং স্কেলের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য এবং একটি পার্থক্য লেখো।

৫. আমাদের বাহুর দৈর্ঘ্য কেন দূরত্বের এককরূপে ব্যবহার করা হবে না?

৬. ৫.৩ মিটারকে সেমিতে প্রকাশ করো।

৭. দুটি শহরের মধ্যে দূরত্ব যদি ৩৭.৩ কিমি হয় তবে তা মিটারে কত হবে?

৮. একজন ছাত্র একটি পেনসিলের দৈর্ঘ্য মাপার সময় তার এক প্রান্ত স্কেলের ৭.৩ সেমি-র স্থানে এবং অন্য প্রান্তটি ২.৯ সেমি স্থানে যদি থাকে তবে ওই পেনসিলের দৈর্ঘ্য কত?

৯. দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপায়গুলি লেখো।

বাড়িতে বসে করো:

- একটি স্কেল ও সুতলির সাহায্যে তুমি নিজের পায়ের দৈর্ঘ্য মাপ নিয়ে এক রেখচিত্র অঙ্কন করো।

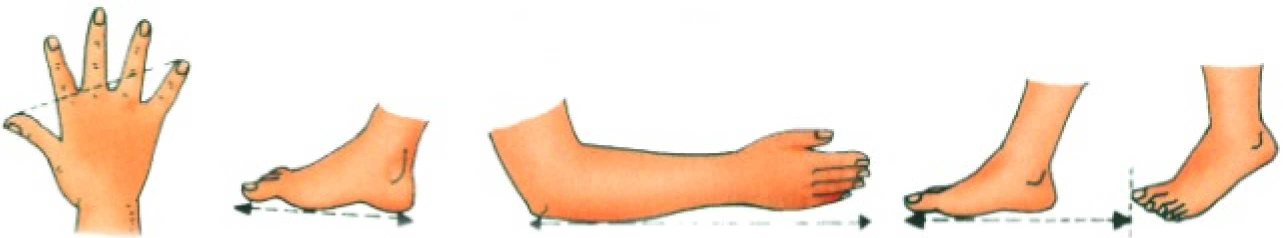

একাদশ অধ্যায় গতি

১১.১ আমাদের আশপাশের গতিশীল বস্তু

তোমার চারদিকে যত বস্তু দেখছ ওদের মধ্যে কিছু স্থির এবং কিছু গতিশীল। তুমি এই গতিশীল ও স্থির বস্তুগুলির একটি তালিকা করো।

সারণী ১১.১ বস্তুর অবস্থা

স্থির	গতিশীল
ঘর	পাখী

কোন্ বস্তু স্থির এবং কোন্‌টি গতিশীল তুমি জানলে কীভাবে? এসো নীচে দেখানো দুটি ছবি দেখে তা জানব।

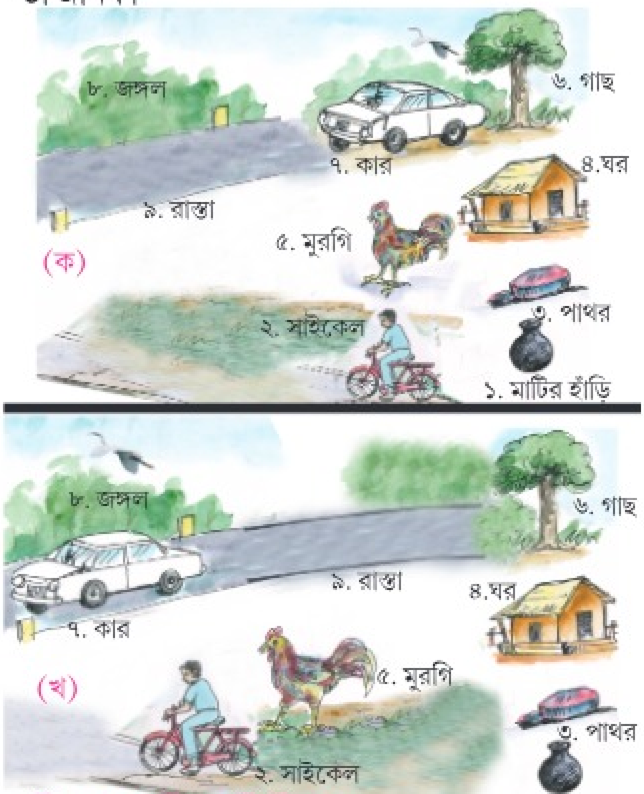

চিত্র ১১.১ স্থির গতিশীল বস্তু

এই ছবি দেখে এদের মধ্যে কোন্‌টি স্থির বস্তু এবং কোন্‌টি গতিশীল বস্তু বলো? চিত্র (ক) পাঁচটি সারির পরে চিত্র 'খ' নেওয়া হয়েছে। চিত্র (ক)-এর কার, পক্ষী ও মানুষ কিছু সময় পরে চিত্র (খ)-তে তাদের স্থান পরিবর্তিত হয়েছে। তাই তারা গতিশীল, কিন্তু ঘর, গাছ, পাথর ও হাঁড়ি কিছু সময় পরে এদের স্থান পরিবর্তিত হয়নি। তাই এরা স্থির বস্তু।

যে বস্তু সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে তাকে গতিশীল বস্তু বলা হয়। আর যে বস্তু সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে না তাকে স্থির বস্তু বলা হয়।

তোমার চারদিকে যত গতিশীল বস্তু দেখছ, তার একটি তালিকা করো।

উপরোক্ত ছবিতে তুমি একটি গতিশীল রাস্তা দেখছ। এই ছবি থেকে স্থির বস্তু ও গতিশীল বস্তুর তালিকা তৈরি করো।

স্থির বস্তু	গতিশীল বস্তু

নিচে চিন্তা কর

রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এই স্থির বস্তুগুলির কিছু কি ভূমিকা রয়েছে? একসাথে সকলে আলোচনা করে সারণীটি পূরণ করো ও ক্লাসে তা উপস্থাপন করো।

স্থির বস্তুর নাম	রাস্তার দুর্ঘটনা এড়াতে ভূমিকা
১. জেব্রা ক্রসিং	
২. রাস্তার মাঝে লাগানো ঝোপঝাড়	রাত্রে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির আলো উলটো দিকে যাওয়া। গাড়ির চালকের চোখে না পড়া।
৩. ট্রাফিক লাইট	
৪. রাস্তার সংকেত	

তোমরা ঘণ্টা, সেলাই মেশিন ও ইলেকট্রিক পাখা ইত্যাদি নিশ্চয় দেখেছ। এগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিজে থেকে যেতে পারে কি? নাকি তাদের বিভিন্ন অংশ চলাচল করে? উদাহরণস্বরূপ ঘড়ির সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটা গতি করে। তেমনি ইলেকট্রিক পাখার ব্লেড ঘোরে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে **সময় অনুসারে বস্তুর বা তার অংশগুলির স্থান পরিবর্তনকে গতি বলা হয়।** এবার এসো, তাদের গতির প্রকারভেদ বিষয়ে এখন আলোচনা করি।

১১.২ গতির প্রকারভেদ:

(ক) রাস্তায় যানবাহন

(খ) প্যারেড

(গ) গাছ থেকে আম পড়া

(ঘ) দৌড়নো

চিত্র ১১.২ সরলরৈখিক গতি।

আগের পৃষ্ঠার ছবিগুলি দেখে তাদের গতির প্রকারভেদ সম্পর্কে বলো। (শিক্ষক ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে উত্তর জানতে চাইবেন।)

এদের গতিকে 'সরলরৈখিক গতি' বলা হয়। তোমার আশপাশে কিংবা আগে দেখা এরূপ সরল রৈখিক গতিতে চলা বস্তুর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

চিত্র ১১.৩ বৃত্তীয় গতি

উপরের ছবিতে বস্তুগুলির গতি ও তোমার জানা সরলরৈখিক গতি কি এক? (শিক্ষকমশাই উপরের ছবি দেখিয়ে বস্তুসমূহের গতি বিষয়ে ছাত্রদের মতামত জানতে চাইবেন।)

চিত্র 'ক'তে ইলেকট্রিক পাখার ব্লেড বৃত্তাকারভাবে ঘুরছে।

চিত্র 'খ'তে চরকি বৃত্তাকার পথে ঘুরছে।

চিত্র 'গ'তে বলদেরা মাড়াইয়ের খুঁটির চারপাশে ঘুরছে।

তোমার কাজ:২

তুমি আধমিটার সুতলি নাও। তার একদিকে একটি আলু ফুটে করে বাঁধো। সেই সুতলির অন্য দিকের মাথায় আঙুল দিয়ে গুটিয়ে ঘোরাও। এই আলু কীভাবে ঘুরছে দেখো। তোমার আঙুল থেকে ওই আলুর দূরত্ব সবসময় সমান থাকে। এই প্রকার গতিকে **'বৃত্তীয় গতি'** বলা হয়। তোমার দেখা এইরকম বৃত্তীয় গতির এক তালিকা প্রস্তুত করো।

আগে যেভাবে করেছিলে সেইমতো আলুকে সুতলি দিয়ে বেঁধে (পাশের ছবি ১১.৪-তে যেভাবে দেখানো হয়েছে)

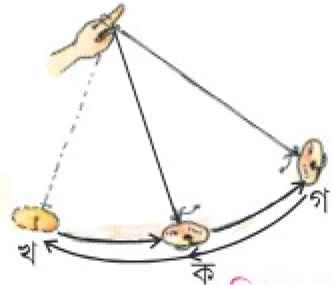

ছবি ১১.৪

মুক্তভাবে ঝুলিয়ে রাখো। মুক্তভাবে ঝুলে থাকা অবস্থানকে অল্প একটু টেনে আনো, তার পরে তাকে ছেড়ে দাও। দেখো, এটি কেমন গতি করে। এটি 'খ' অবস্থান থেকে 'ক' অবস্থান দিয়ে 'গ' পর্যন্ত থাকে এবং সেখান থেকে 'ক' দিয়ে 'খ' পর্যন্ত আসবে। এটি এভাবেই গতি করবে। শেষে এটি স্থির হবে।

এখানে আলুটি এক নির্দিষ্ট সময় পরে তার গতিকে পুনরাবৃত্তি করছে। এই প্রকার গতিকে 'দোলন গতি' বলে। এবার এই প্রকার দোলন গতির কয়েকটি উদাহরণ তোমার খাতায় লেখো।

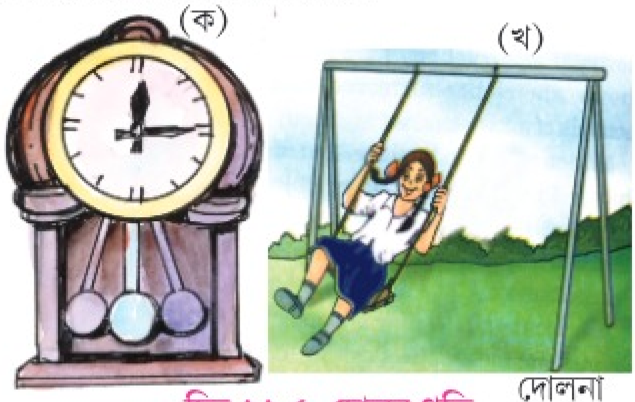

চিত্র ১১.৫ দোলন গতি

চিত্র ১১.৬

১১.৩ একটি বস্তুর একাধিক গতি

উপরের 'ক' ছবিতে কী দেখছ? এখানে মেশিনটি

একটি জায়গায় আছে। দর্জির পা চালানোর ফলে মেশিনের চাকা এক বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে এবং মেশিনের ছুঁচের ওঠানামার ফলে সরলরৈখিক গতি করে।

তেমনি পূর্ব পৃষ্ঠার ১১.৬ 'খ' চিত্র দেখে

ছবি ১১.৭ আবর্তী গতি

এখানে কী কী প্রকার গতি দেখা যাচ্ছে তা তোমার খাতায় লেখো।

সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণন বৃত্তীয় গতির উদাহরণ হলেও পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকের গতিকে আবৃত্ত বলে। (তেমনি একটি দেওয়াল ঘড়ি, চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং সার্কাসে দেখানো নানা প্রকার গতি বিষয়ে মাস্টারমশাই ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।) কোন্ বস্তুগুলি একাধিক গতি করে খাতায় লেখো। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বস্তুর একাধিক গতি বিষয়ে আলোচনা করো।

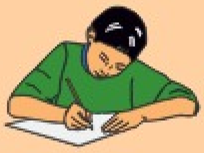

কী শিখলাম?

- সময় অনুসারে বস্তু তার অংশগুলির স্থান পরিবর্তনকে গতি বলা হয়।
- যে বস্তু সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে তাকে গতিশীল বস্তু বলা হয়।
- যে বস্তু সময়ের সঙ্গে নিজের স্থান পরিবর্তন করে না তাকে স্থির বস্তু বলা হয়।
- গতি নানা প্রকার; যথা:

  সরলরৈখিক বৃত্তীয়

  আবর্তী দোলন
- বস্তুর বিভিন্ন অংশের একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের গতি পরিলক্ষিত হয়।

অভ্যাস

১. নিম্নে প্রদত্ত বাক্যগুলি পড়ো এবং ভুল থাকলে ঠিক করে খাতায় লেখো।

(ক) সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনকে গতি বলা হয়।

(খ) একটি গতিশীল স্কুটারের চাকার গতি কেবল সরলরৈখিক হয়।

(গ) তুমি একটি ট্রেনের প্রথম বগিতে বসেছ ও তোমার বন্ধু ট্রেনের শেষ বগিতে বসেছে। সুতরাং তোমার বন্ধু তোমার চেয়ে গতিশীল।

(ঘ) তোমার জন্য সূর্য গতিশীল।

(ঙ) আগুন লাগানোর পরে চরকি ফটকা কেবল চক্রাকারে (বৃত্তীয় গতি) ঘোরে।

২. সাইকেল চালানোর সময় তার মধ্যে কী প্রকার গতি দেখা যায় ?

৩. বৃত্তীয় গতি ও আবর্ত্তী গতির মধ্যে সামঞ্জস্য এবং পার্থক্য বিষয়ে লেখো। প্রত্যেক গতির দুটি করে উদাহরণ দাও।

৪. কোন্ স্থির বস্তু রাস্তায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

৫. তুমি একটি চলন্ত বাসে বসে থাকার সময়

(ক) বাসটি কি তোমার গতিশীল বলে মনে হয়।

(খ) রাস্তার ধারে থাকা গাছ কি তোমার গতিশীল বলে মনে হয় ?

৬. কী উপায়ে তুমি একটি পাহাড়কে গতিশীল বলে মনে করবে তা লেখো। এ বিষয়ে তোমার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করো।

৭. উদাহরণ দেখে সারণীটি পূরণ করো।

গতিশীল বস্তু	গতির নাম
ঘড়ির কাঁটা ঘোরা	
মোটর সাইকেলের চাকা ঘোরা	
সেলাই মেশিনের ছুঁচের গতি	
হাতপাখা ঘোরানো	
লাট্টু ঘোরা	

বাড়িতে বসে করো:

- সরলরৈখিক গতির একটি উদাহরণসহ চিত্র এঁকে দেখাও।
- তোমার বাড়ির বারান্দায় একটি সাদা কাগজ বিছিয়ে তার নানা জায়গায় কিছু চিনি ছড়িয়ে দাও। কিছু সময় পরে দেখবে পিঁপড়ের দল এসে এগুলো খেতে শুরু করবে। তাদের গতি চিহ্নিত করে একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদ্যুৎ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা যে কত তা তুমি নিশ্চয় অনুভব করতে পারো। রাত্রে রাস্তাঘাটে আলোর জন্য এবং ঘরে বিদ্যুতের আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইস্ত্রি প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ আবশ্যক। এই বিদ্যুৎ শক্তি কয়েকটি সংস্থা সরবরাহ করে। কখনও কখনও জেনারেটারের সাহায্যে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপকরণ চালু থাকতে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। রাত্রে বাইরে বেরোনোর সময় আমরা টর্চ নিয়ে বেরোই। টর্চের সুইচ টিপলে আলো জ্বলে ওঠে। টর্চ লাইটে এক বা একাধিক সেল বিদ্যুতের উৎসরূপে কাজ করে। একাধিক সেলের সমারোহকে ব্যাটারি বলা হয়।

ব্যাটারি চালিত খেলনা নিশ্চয়ই দেখেছ। এগুলি বিদ্যুতের সাহায্যে ঘোরাঘুরির সঙ্গে আলো ও শব্দতরঙ্গও সৃষ্টি করে।

তোমার জানা ব্যাটারি চালিত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো। এই তালিকার সঙ্গে সহপাঠীদের তালিকার তুলনা করো। সকলে মিলে ও মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে ড্রইং কাগজে তালিকাটি লেখো ও তা শ্রেণীকক্ষে টাঙাও।

এবার এই অধ্যায়ে সেল নিয়ে কিছু পরীক্ষা করা যাক এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ বিষয়ে কিছু শেখা যাক।

১২.১ সেল (Cell)

টর্চে যে সেল ব্যবহার করা হয় সেরকম একটি সেল নাও। তার রেখাচিত্র এঁকে তলায় দেওয়া চিত্রের সঙ্গে তুলনা করো।

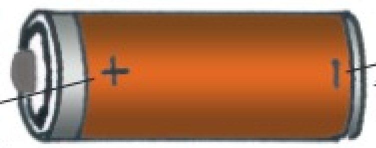

চিত্র ১২.১ বিদ্যুৎ সেল

সেলের একদিকের মাথার বাইরের দিকে ছোট ধাতব টুপি ও অন্যদিকের মাথায় একটি ধাতব ফলক দেখা যায়। এই ফলকটি একটি ধাতব পাত্রের নিম্নাংশ। সেলের চাদরে ঢাকা শরীরে টুপির দিকে যুক্ত (+) ও অন্যদিকে বিযুক্ত (–) চিহ্ন দেওয়া থাকে। ধাতব টুপিকে যুক্ত বিদ্যুতঅগ্র (Positive Terminal) ও ধাতব পাত্রকে বিযুক্ত বিদ্যুতঅগ্র (Negative Terminal) বলা হয়। সেলের ভিতরে কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে। যখন ওই সেল থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রয়োজন হয় তখন ওই রাসায়নিক পদার্থ অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় ও ওর ভিতরের রাসায়নিক শক্তি (Chemical Energy) বিদ্যুৎ শক্তি (Electrical Energy)-তে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে মূল রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ কমে যায়। সেটি যখন একেবারেই শেষ হয়ে যায়, সেলটি তখন আর বিদ্যুৎশক্তি জোগাতে পারে না। এই ধরনের সেলে রাসায়নিক পদার্থটি প্রায় শুকনো অবস্থায় রয়ে যায় তখন একে শুষ্ক সেল (Dry Cell) বলা যায়। টর্চ ছাড়া ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, সেলফোন, কম্পিউটার প্রভৃতি উপকরণে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের শুষ্ক সেল ব্যবহার করা হয়। মোটর গাড়ি, স্কুটার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি যানবাহনে আলাদা আলাদা ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। এতে রাসায়নিক পদার্থটি তরল বা জলীয় অবস্থায় থাকে।

১২.২ বিদ্যুৎ পরিপথ (Electrical Circuit)

এখন একটি সেল নিয়ে একটি টর্চের বাল্ব থেকে আলো জ্বালাতে চেষ্টা করো। এজন্য আর কী সরঞ্জাম প্রয়োজন?

তোমার কাজ: ১

১০ থেকে ১২ সেমি লম্বার চারটি সরু প্লাস্টিকে মোড়া বিদ্যুতের তার নাও। তারগুলির দুদিকের ১-১.৫ সেমি পর্যন্ত আবরণ ছড়িয়ে দাও। দেখবে যেন আবরণের ভিতরে তার যেন ছিঁড়ে না যায় বা তারের মুখগুলি যেন আলাদা আলাদা হয়ে না যায়। এবার দুটি তারের দুটি মাথা সেলের ধাতব টুপি ও ধাতব পাত্রের নিম্নভাগ সমেত আঠালো কাগজ বা সেলোটেপ দিয়ে জুড়ে দাও। এই দুটি তারের শেষ অংশকে যথাক্রমে ১ ও ২ বলা যাক। ১২.২ চিত্র দেখো। তেমনি অন্য দুটি তারের মাথাকে বাল্বের ধাতব আধার ও তার নীচের চিত্র

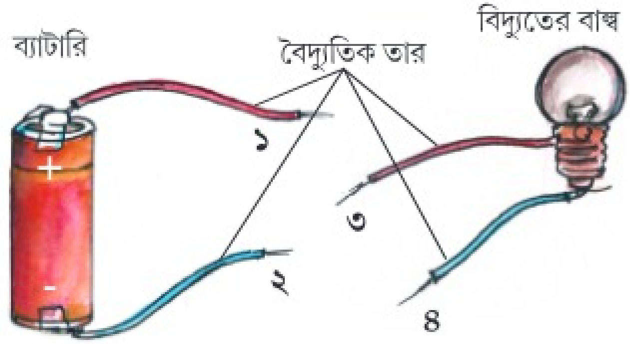

নং ১২.২ (ক)বিদ্যুৎ সেল (খ) বিদ্যুতের বাল্ব

ছোট টুকরো ধাতুর সঙ্গে জুড়ে দাও। এই দুটি তারের শেষ অংশকে যথাক্রমে ৩ ও ৪ বলা যাক।

এভাবেই এর পরের কাজের জন্য সেল ও বাল্ব তৈরি হয়।

সতর্ক সূচনা:

বিদ্যুতের তার নিয়ে কাজ করার সময় দেখবে যেন খোলা তারের মুখগুলি তোমার আঙুল বা হাতে না লাগে। সেলের তড়িৎপ্রবাহ বিশিষ্ট দুটি তারের শেষ অংশ ১ ও ২ যেন পরস্পরের সঙ্গে লেগে না থাকে, লেগে থাকলে সেলের ভিতরের রাসায়নিক পদার্থ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ও সেলটি অকেজো হয়ে যাবে।

তোমার কাজ: ২

এবার বাল্বটি সেলের কাছে নিয়ে শেষ অংশ ৩-কে ১ এবং ৪-কে ২-এর সঙ্গে লাগিয়ে দাও। দেখবে, বাল্বটি জ্বলে উঠবে। বিদ্যুতের তারের মাধ্যমে সেল ও বাল্বের এই সংযুক্ত ব্যবস্থাকে মুদিত বিদ্যুৎ পরিপথ (Closed Electric Circuit) বলা হয়। এ ক্ষেত্রে সেলের জুড়ে দেওয়া বিদ্যুতের মুখ থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ তারের ভিতর দিয়ে এসে শেষাগ্র ১ ও ৩ দিয়ে বাল্বে ঢোকে এবং বাল্ব থেকে শেষাংশ ৪ ও ২-এর মাধ্যমে সেলের বিযুক্ত বিদ্যুতের মুখে ঢোকে। এইভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি আবর্তিত হয় এবং বাল্ব জ্বলে উঠে। এখন ৩ ও ১-কে জুড়ে ৪ ও ২-কে পৃথক করে দিলে বাল্ব আর জ্বলবে না, নিভে যাবে। ৪ ও ২-এর মধ্যে আলাদা হওয়াতে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি বাধা পায় এবং সেল থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এবার ৪ ও ২-কে জুড়ে দিয়ে ৩ ও ১-কে পৃথক করে দাও। গতিপথ মুক্ত হল কি না? এবার ৩-কে ২-এর সঙ্গে ও ৪-কে ১-এর সঙ্গে জুড়ে দাও। বাল্ব জ্বলল কি না? গতিপথ মুক্ত হল কি না দেখো।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি জানলে যে

- মুদিত বা সম্পূর্ণ গতিপথে বিদ্যুৎপ্রবাহ হতে পারে। কিন্তু গতিপথে বাধা পেলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।
- সুতরাং সেল থেকে তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করতে হলে গতিপথে বাধা সৃষ্টি করতে হবে বা দুইয়ের মধ্যে ফাঁক রাখতে হবে।

বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিপথে বাধা দিতে হলে উপকরণগুলিকে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবহার করা যায়। একে সাধারণত সুইচ (Switch) বলা হয়। টর্চলাইটের সুইচের কথা তুমি জানো। তুমি নিজে একটি সাধারণ সুইচ তৈরি করতে পারবে।

১২.৩ বিদ্যুতের সুইচ (Electric Switch)

তোমার কাজ: ২-তে তুমি নিজের হাতে তারের সঙ্গে তার জুড়ে বিদ্যুতের গতিপথ মুক্ত করে দিচ্ছিলে ও তারগুলি পরস্পর থেকে আলাদা করে প্রবাহের গতিপথ রুদ্ধ করছিলে। এই কাজটি একটি সুইচের সাহায্যে করা যায়। আগে তুমি একটি সুইচ তৈরি করো।

তোমার কাজ: ৩

একটি পরিষ্কার মরচে না লাগা ধাতব সেফটিপিন ও দুটি চওড়া মাথাওয়ালা ধাতব ড্রইং পিন নাও। একটি থার্মোকল কাটা বা মোটা কার্ডবোর্ড পাটাতে সেফটিপিনটি লম্বা করে রাখো। তার শেষের গোল অংশের মাঝখানে একটি ড্রইং পিন এমনভাবে চাপ দিয়ে বসিয়ে দাও যেন পিনের চারপাশে সেফটিপিনটি ঘুরতে পারে। একটু দূরে বোর্ডের উপরে অন্য ড্রইং পিনটি চাপ দাও যাতে দুটি পিনের দূরত্ব সেফটিপিনের দৈর্ঘ্য থেকে কম হয় ও সেফটিপিনটি ঘুরিয়ে দিলে তার উপরের মাথা দ্বিতীয় পিনটি যেন ছুঁতে পারে। চিত্র ১২.৩ ভালোভাবে দেখো।

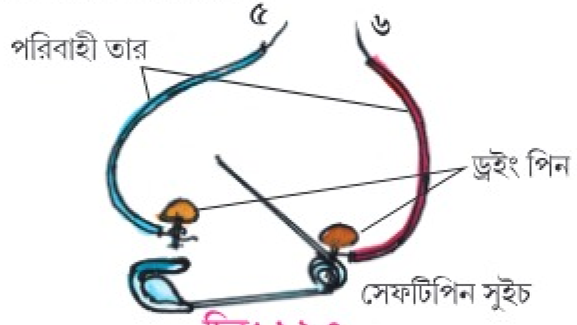

চিত্র: ১২.৩

দুটি বিদ্যুতের তার নিয়ে দুটির মুখ আবরণমুক্ত করো। একটি তারের সামনেটা সেফটিপিনের নীচের গোল অংশের সঙ্গে ভালো করে জুড়ে দাও। অন্য তারের একদিকের মুখটি দ্বিতীয় পিনের সঙ্গে টেনে গুটিয়ে নাও। দুটি তারের অন্য দুটির মুখকে ৫ ও ৬ বলে ধরা যাক। এখন বলা যায় মোটামুটি একটা সুইচ প্রস্তুত হল।

সেফটিপিন দিয়ে তৈরি এই সরল সুইচ কাজ করছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখো।

তোমার কাজ: ৪

তুমি আগে তৈরি করা তারযুক্ত সেল ও তারযুক্ত বাল্ব নাও। অগ্র ১-কে ৩, ৪-কে ৫, ও ২-কে ৬-এর সঙ্গে ভালো করে জুড়ে দাও। সেফটিপিনের উপরের মাথা যদি ড্রইং পিন না ছোঁয় তবে বিদ্যুতের প্রবাহ পথ অসম্পূর্ণ ও মুক্ত থাকবে। কাজেই বাল্বটি জ্বলবে না। একে সুইচের বিচ্ছিন্ন অবস্থা বলা যায়। চিত্র 'ক' দেখো। এখন সেফটিপিনটি এমনভাবে ঘুরিয়ে দাও যাতে তার উপরের মাথাটি ড্রইং পিনকে স্পর্শ করে। এর ফলে গতিপথে বিদ্যুতের প্রবাহ চালু হবে ও বাল্বটি জ্বলবে। এটি সুইচের বিদ্যুৎপ্রবাহ অবস্থা।

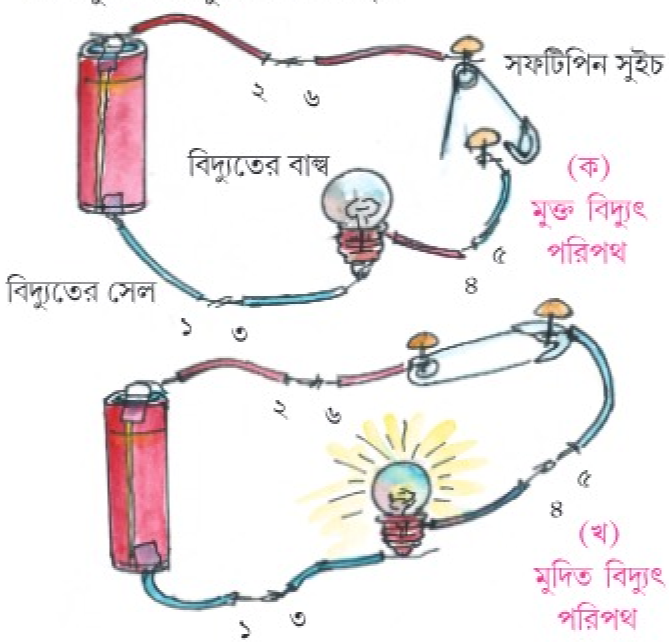

চিত্র: ১২.৪ মুক্ত ও মুদিত পরিপথ

সেফটিপিনের বদলে ধাতুনির্মিত কাগজ আটকানোর ক্লিপে (Paper Clip) ও ড্রইং পিনের পরিবর্তে সরু লোহার পিনের সাহায্যেও সরল সুইচ তৈরি করা যায়। কিন্তু এসব মরচে না ধরা ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তুমি তৈরি করা সাধারণ সুইচের সঙ্গে টর্চের সুইচের তুলনা করো। বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার করা হলে সেজন্য ব্যবহৃত সুইচ তুমি দেখেছ। সেই সুইচটি কীভাবে মুক্ত ও মুদিতঙ্খ প্রবাহগতি সরবরাহ ও রদ করা যায়? তোমার সরল সুইচের তুলনায় এটি অনেক জটিল মনে হলেও দুটির কার্যপদ্ধতি কিন্তু এক।

১২.৪ বিদ্যুৎ সুপরিবাহী ও কুপরিবাহী (Electrical Conductors and Non-conductors)

তুমি লক্ষ্য করেছ, বিদ্যুৎ পরিপথের প্রস্তুতি ও সুইচ তৈরির জন্য ধাতব তার ও ধাতব বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে। ধাতুর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ হওয়ায় একে সুপরিবাহী (Conductor) বলা হয়। তুমি ভাবতে পারো ধাতুর বদলে সুতো, কাগজ, রবার বা প্লাস্টিকের সাহায্যে কীভাবে বিদ্যুৎ পরিপথ তৈরি করা সম্ভব? এই পদার্থগুলো কি সুপরিবাহী? এ প্রশ্নের উত্তর পাবে কী ভাবে?

তোমার কাজ: ৫

তুমি আগের কাজে ব্যবহৃত পরিপথ থেকে সুইচটি বের করে নাও। পরিপথের অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রদত্ত চিত্রের মতো দেখা যাবে। বাল্বটি জ্বলছে কি? উঠোন বা টেবিলের উপরে শুকনো একটি কাগজ বিছিয়ে তার উপরে পরিবাহী পদার্থটি রাখো। তার সামনের ২ ও ৪ মুখটি ওই কাগজে ছুঁইয়ে দেখো। বাল্বটি কি জ্বলছে? না, কারণ পরিবাহী পদার্থটি খোলা অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ কাগজের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত

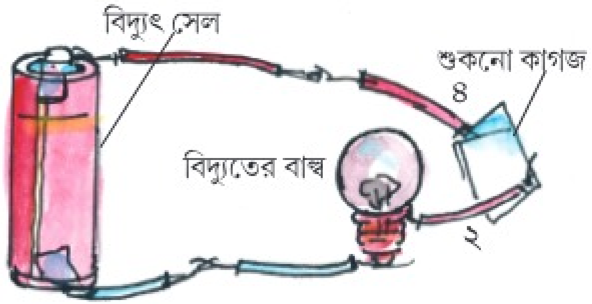

চিত্র ১২.৫ বিদ্যুৎ পরিবাহী পথে কুপরিবাহী ও সুপরিবাহী পরীক্ষা।

হচ্ছে না বা কাগজ একটি অপরিবাহী পদার্থ আর একটি কথা মনে রেখো। মুখের ২ ও ৪ ভিতরে যে ফাঁক রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু বায়ু রয়েছে। অতএব বায়ুকেও বলা চলে যে সেটি এক অপরিবাহী বস্তু।

এখন শুকনো কাঠি, লোহার পিন, প্লাস্টিক স্কেল, দেশলাইকাঠি, রবার, অ্যালুমিনিয়াম চামচ, ডিভাইডার প্রভৃতি তোমার আশপাশের পদার্থ নিয়ে প্রতিটিতে অগ্র ২ ও ৪-এর সামনের মুখ ছুঁইয়ে দেখো। কোন্‌গুলি সুপরিবাহী ও কোন্‌গুলি অপরিবাহী লিখে রাখো। এবং নিম্নলিখিত সারণী অনুসারে তালিকাটি প্রস্তুত করো।

সারণী ১২.১ বিদ্যুৎ সুপরিবাহী ও কুপরিবাহীর পরীক্ষা।

পদার্থ	নির্মাণস্থল	বাল্ব জ্বলছে কী না	পদার্থের প্রকারভেদ।
লোহাপেরেক	লোহাধাতু	হ্যাঁ	সুপরিবাহী
কাচের শিশি			
স্কেল			
ডিভাইডার			

চিনা মাটির চায়ের কাপ, তোমার কলম ও পেনসিল সুপরিবাহী কি? প্রথমে ভেবে নাও তারপরে পরীক্ষা করো।

বিদ্যুৎ সুপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার তুমি জানো। সুপরিবাহী নয় এমন পদার্থেরও প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যুতের তারকে প্লাস্টিকের মতো অপরিবাহী দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেওয়া যায় যার ফলে তার অন্য কোনো সুপরিবাহীর সংস্পর্শে এলে অসুবিধা হয় না। কিছু বৈদ্যুতিক উপকরণ আমরা হাতে ধরি বা ছুঁয়ে ব্যবহার করি। যেমন: সুইচ, প্লাগ, ইস্ত্রি প্রভৃতি। বিদ্যুতের সংস্পর্শে আমাদের হাতে যাতে না আসে সেজন্য ইস্ত্রির হ্যান্ডেল, সুইচ ও প্লাগের উপরের অংশ বিদ্যুৎ পরিবাহিত না হওয়ার জন্য প্লাস্টিকের মতো পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। এমন আর কী বৈদ্যুতিক উপকরণ তুমি জানো যার মধ্যে বিদ্যুৎ স্পন্দন অনুভূত হয় না তার তালিকা করো।

সতর্ক সূচনা

আমাদের শরীর বিদ্যুৎ সুপরিবাহী সুতরাং খালি বা ভেজা হাতে কখনও বৈদ্যুতিক উপকরণের ধাতব অংশ ছোঁবে না। বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে খোলা প্ল্যাগ পয়েন্ট বা সকেট থাকলে তার ভিতরে আঙুল বা অন্য কিছু ঢোকাবে না। তাহলে মারাত্মক ইলেকট্রিক শক লাগতে পারে। এ ব্যাপারে ছোট ছোট ভাইবোনেদের বুঝিয়ে দেবে।

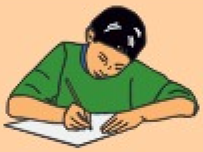

কী শিখলাম ?

- বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, হিটার, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন।
- টর্চ, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি উপকরণ সেল বা ব্যাটারিতে চলে।
- একাধিক সেলের সংযুক্ত রূপকে ব্যাটারি বলে।
- সেল বিদ্যুতের উৎস রূপে কাজ করে। এর একটি বিদ্যুতের মুখ থাকে যুক্ত ও অন্য একটি মুখ থাকে খোলা।
- টর্চে সেল বা ব্যাটারি বাল্ব ও সুইচ থাকে। সুইচে চাপ দিলে সেল ভিতরের রাসায়নিক পদার্থ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ও বাল্ব জ্বলে ওঠে।
- বিদ্যুৎ সুপরিবাহী পথটি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার জন্য আবৃত্ত থাকা প্রয়োজন।
- সুইচের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার পথটি মুক্ত ও রুদ্ধ করা যায়।
- যে বস্তুর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তা সুপরিবাহী এবং যে বস্তুর ভিতর দিয়ে প্রবাহ হয় না তা অপরিবাহী। সাধারণত ধাতব পদার্থগুলি সুপরিবাহী।
- সুরক্ষিত রাখার জন্য বৈদ্যুতিক উপকরণের সুপরিবাহী অংশকে যে পদার্থে বিদ্যুৎপ্রবাহ থাকে না তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

অভ্যাস

১. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) সেলে —— শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়।

(খ) গাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারিতে রাসায়নিক পদার্থ —— অবস্থায় থাকে।

(গ) পরিপথে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য ওই পথ —— হওয়া দরকার।

(ঘ) সেলের বিদ্যুৎগুলির নাম —— ও —— ।

২. ভুল থাকলে সংশোধন করে লেখো।

(ক) সেলের বিযুক্ত বিদ্যুতের মুখ বন্ধ করার জন্য ধাতব বস্তু দরকার।

(খ) থারমোকলের বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়।

(গ) বিদ্যুৎ অপরিবাহী বস্তুটি সুইচের কাজ করতে পারে।

(ঘ) পরিপথে বিদ্যুৎপ্রাবহ সেলের যুক্ত বিদ্যুতের মুখ থেকে বেরিয়ে বিযুক্ত বিদ্যুতের মুখের দিকে যায়।

৩. কারণ নির্দেশ করো।

(ক) একটি বিদ্যুৎ পরিপথে বাল্ব ও তারের জুড়ে দেওয়া জায়গাগুলি ঠিক আছে। সুইচও ঠিক আছে। কিন্তু বাল্ব জ্বলছে না।

(খ) বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপরে প্লাস্টিকের আবরণ দেওয়া হয়।

৪. একটি সেলের দুটি বিদ্যুৎতন্ত্রের সঙ্গে একটুকরো তামা তারের সংযোগ ঘটলে কী হতে পারে তা বুঝিয়ে দাও।

বাড়িতে বসে করো:

- সহপাঠীদের সঙ্গে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের শুকনো সেল সংগ্রহ করো। সেগুলির নাম ও সেগুলি কোন্ উপকরণে ব্যবহৃত হত লেখো।
- সেফটিপিন বা কাগজ ক্লিপ ছাড়া আর কোন্ বস্তু দিয়ে সুইচ তৈরি হতে পারে চিন্তা করো ও তদনুসারে কার্যক্ষম একটি মডেল তৈরি করো।
- একটি বা দুটি সেল ও একটি বাল্ব দিয়ে শ্রেণীগৃহে ব্যবহারের জন্য টর্চলাইট তৈরি করো।
- একটি টর্চে দুটি টর্চ সেল কীভাবে সাজনো হয়েছে দেখো ও তার একটি ছবি আঁকো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চুম্বক

চিত্রে একটি পিন ডিবার ছবি দেখানো হয়েছে। ডিবার উপরের অংশটি খোলা ও মাঝখানে একটি লাঠি আছে। ডিবার ভিতরে কিছু পিন রয়েছে। ডিবাটি উলটিয়ে ধীরে ধীরে ঝাড়লে পিনগুলি ডিবার বাইরে না পড়ে ওই লাঠিতে লেগে যায়। লাঠি থেকে পিন ছাড়াতে চেষ্টা করলে মনে হয় লাঠিটা যেন পিনগুলো টেনে ধরেছে। এর কারণ কী বলো তো? ডিবার ভিতরের লাঠিটি কি চুম্বক? লোহার মতো দেখতে ছোট ধাতুর টুকরো দিয়ে দেবদেবীর ফটো ইত্যাদি লোহার আলমারিতে কিংবা রেফ্রিজারেটরের দরজাতে লাগানো থাকে তুমি তা দেখেছ। এই ধাতু কি চুম্বক মনে হয়? তোমাদের মধ্যে আলোচনা করে জেনে নাও।

চিত্র:১৩.১ পিন ডিবা

চিত্র ১৩.২ (ক) লোহার আলমারি (খ) রেফ্রিজারেটর

তুমি অন্য ধরনের চুম্বক ও তার ব্যবহার কোথাও দেখেছ? চুম্বকের আকৃতি, ধর্ম ও ব্যবহার বিষয়ে এই অধ্যায়ে তুমি কিছু জানবে। চুম্বক বিষয়ে অনেক কথা জানার আছে। এসো, একটি বেশ মজার কাহিনী দিয়ে চুম্বকের আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব।

১৩.১ চুম্বকের আবিষ্কার

অনেক বছর আগে গ্রিস দেশে এশিয়া মাইনর নামে একটি অঞ্চল ছিল। সেখানে ম্যাগনেস নামে একজন মেষপালক বাস করত। সে একবার একটি পাহাড়ে ভেড়া চরাচ্ছে। তার হাতে লোহার হাতলওয়ালা একটি লাঠি। হঠাৎ সে অনুভব করল একটুকরো পাথর যেন ওই লাঠিটাকে টানছে। কিছু সময় ভাবার পর সে বুঝতে পারল যে ওই পাথরের মধ্যে লোহা আকর্ষণ করার শক্তি আছে। মেষপালকের নামানুসারে ওই প্রকার পাথরের নাম হল ম্যাগনেট। ম্যাগনেটের ওড়িয়া অনুবাদ হল চুম্বক। এর অন্য নাম লোডস্টোন। এতে ম্যাগ্নেটাইট নামক লোহা পাথর থাকে। প্রাকৃতিক চুম্বক ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের চুম্বক তৈরি করা হয় যাকে বলা হয় কৃত্রিম চুম্বক।

১৩.২ চুম্বকের বিভিন্ন আকৃতি

প্রাকৃতিক চুম্বকের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। কিন্তু বিভিন্ন আকৃতির কৃত্রিম চুম্বক পাওয়া যায়। যেমন: দণ্ড চুম্বক, অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক বা ইউ (ড) আকৃতির চুম্বক, বাল্ব জাতীয় চুম্বক, ছুঁচ জাতীয় চুম্বক ও কম্পাস ইত্যাদি এগুলির চিত্র দেওয়া হল—

তুমি কি এছাড়া অন্য কোনো আকৃতির চুম্বক দেখেছ? যদি দেখে থাকো তবে তার ছবি এঁকে মাস্টারমশাই ও সহপাঠীদের দেখাও।

১৩.৩ চুম্বকীয় ও অচুম্বকীয় বস্তু

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, তা তুমি জানো। লোহাকে সেজন্য একটি চুম্বকীয় বস্তু বলে। সাধারণভাবে বলা যায়, চুম্বক যে বস্তুকে নিজের দিকে টানে সেগুলি হচ্ছে চুম্বকীয় বস্তু। চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত না হওয়া বস্তু হল অচুম্বকীয় বস্তু। এদের চেনার উপায় কী?

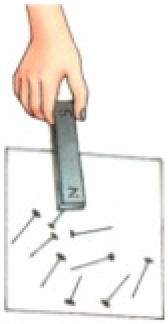

চিত্র ১৩.৪ চুম্বকীয় অচুম্বকীয় বস্তু পরীক্ষা।

তোমার কাজ: ১

তোমার চারিদিক থেকে কিছু বস্তু সংগ্রহ করো। দণ্ড চুম্বকটি নাও। তার একদিকের মাথাটা হাত দিয়ে ধরে অন্য দিকের মাথাটা জোগাড় করে আনা বস্তুর কাছে নিয়ে যাও। বস্তুটি চুম্বকের দিকে এগিয়ে আসছে কি না দেখো। অন্য বস্তুগুলি নিয়েও এভাবে পরীক্ষা করো। লোহার গুঁড়ো, কাচ, কাঠ, থার্মোকল, প্লাস্টিক কাগজ, তামার তার প্রভৃতি বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করো। কী জানলে তা নীচের সারণীতে লেখো। বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যা বুঝলে সে বিষয়ে মাস্টারমশাই ও সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো। ড্রইং কাগজে এমনিভাবে সারণী তৈরি করে তোমার শ্রেণীঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখো।

সারণী ১৩.১ চুম্বকীয় ও অচুম্বকীয় বস্তু

বস্তুর নাম	কী থেকে তৈরি	চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় কি?	বস্তুর প্রকার
লোহার গুঁড়ো	লোহা (ধাতু)	হ্যাঁ	চুম্বকীয়
স্কেল	প্লাস্টিক	না	অচুম্বকীয়
তামার তার			

পরীক্ষা করলে তুমি জানতে পারবে যে লোহা ছাড়া নিকেল ও কোবলিট হচ্ছে চুম্বকীয় পদার্থ। এগুলি ধাতু শ্রেণীর। কিন্তু ধাতু মাত্রই চুম্বকীয় পদার্থ নয়। অ্যালুমিনিয়াম, সীসা, তামা ইত্যাদি ধাতু অচুম্বকীয়। সব কৃত্রিম চুম্বক চুম্বকীয় বস্তু থেকে তৈরি হয়। কখনও কখনও নিকেল, কোবলিট ইত্যাদি ধাতু আলুমিনিয়াম মিশিয়ে হালকা ও শক্ত চুম্বক তৈরি করা হয়। একে অ্যানিলকো (Alnico) চুম্বক বলা হয়।

১৩.৪ চুম্বকের মেরু

এবার এসো চুম্বকের আকর্ষণ ধর্ম সম্পর্কে আর একটু ভালো করে বোঝা যাক।

তোমার কাজ: ২

পিনটি টেবিলের উপরে রাখো। দণ্ড চুম্বকটির একদিক পিনের কাছে নাও। কী দেখবে? চুম্বকের অন্যান্য অংশ পিনের কাছে নিয়ে এসো ও সর্বদা লক্ষ্য রাখো যে পিন কী করছে? চুম্বকের দুদিকেই পিনটি এগিয়ে আসছে কি? চুম্বক লাঠির দুটি মাথার মাঝের অংশও কি পিনকে টানতে পারছে?

তাহলে তুমি দেখলে যে **দণ্ড চুম্বকের বিভিন্ন অংশ প্রতিটি পিন সমানভাবে আকর্ষিত হচ্ছে না।**

চুম্বকের এই গুণ সম্পর্কে আরও জানার জন্য নীচের পরীক্ষাটি করে দেখো।

তোমার কাজ: ৩

টেবিলের উপরে একটুকরো কাগজ বিছিয়ে তার উপরে কিছু লোহার গুঁড়ো বিছিয়ে দাও। এবার এর উপরে দণ্ড চুম্বকটি গড়িয়ে দাও। ওই চুম্বকের কোন্ অংশে বেশি লোহার গুঁড়ো লেগেছে তা ভালো করে দেখো। চুম্বকের মাঝের অংশের চেয়ে দুই প্রান্তে বেশি লোহার গুঁড়ো লেগে রয়েছে, তাই তো?

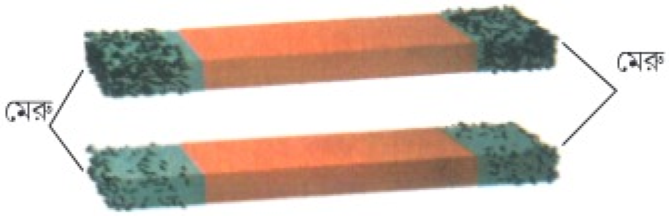

লোহার গুঁড়ো না পাওয়া গেলে বাসন মাজার জন্য দোকান থেকে এনে কাটারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে এর পরীক্ষা করতে পারো। কিংবা অনেকগুলো ছোট ছোট পিন নিয়েও এই পরীক্ষা করা যেতে পারে।

বেশি চুম্বকীয় গুণ যুক্ত চুম্বকের দুটি প্রান্তকে মেরু বলে। উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে তুমি জানলে যে দণ্ড চুম্বকের দুটো মেরু রয়েছে। অন্য আকৃতির কৃত্রিম চুম্বক নিয়ে এই পরীক্ষা করলে এটাই হবে। এ থেকে তুমি জানলে যে চুম্বকের দুটি মেরু থাকে। যার আকর্ষণ গুণ চুম্বকের অন্য অংশের আকর্ষণের গুণ থেকে বেশি।

চুম্বকীয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ছাড়া চুম্বকীয় মেনুর অন্য কোনো গুণ কি আছে? হ্যাঁ, **চুম্বকীয় মেরু দিকনির্ণয় করতে পারে।**

১৩.৫ চুম্বক দ্বারা দিকনির্ণয়

চুম্বকের মাধ্যমে দিকনির্ণয়ের কথা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা। অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রের মাঝে জাহাজের দিকনির্ণয় করার ক্ষেত্রে চুম্বকের সাহায্য নেওয়া হত। চুম্বক কীভাবে দিকনির্ণয় করে এবার দেখা যাক।

তোমার কাজ: ৪

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক তুমি কীভাবে বুঝতে পারো? সূর্য পূর্ব দিকে উঠে। সকালে পূর্ব দিকে বা সূর্যের দিকে মুখ করে সোজা দাঁড়ালে তোমার পিঠ পশ্চিম দিকে, বাঁ হাত উত্তর দিকে ও ডান হাত দক্ষিণ দিকে থাকবে। এই ভাবে শ্রেণীগৃহের এক খোলা জায়গায় বা বিদ্যালয়ের বারান্দার একটি জায়গায় পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্ণয় করে স্কেল ও ছকের সাহায্যে শ্রেণীগৃহের মেঝেতে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিকে দুটি সরলরেখা অঙ্কন করো যেন তারা সমকোণে পরস্পরকে ছেদ করে। প্রয়োজন মনে হলে সহপাঠী ও মাস্টারমশাইয়ের সাহায্য নিতে পারো।

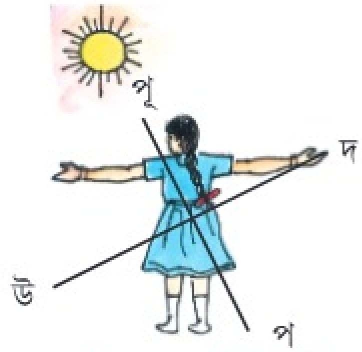

চিত্র: ১৩.৬ দিকনির্ণয়

মনে রেখো, খালি চোখে কখনও সূর্যের দিকে তাকাবে না।

একটি দণ্ড চুম্বক নিয়ে তার এক প্রান্তে চক দিয়ে চিহ্নিত করো। একটি লম্বা কাষ্ঠখণ্ডের মাঝখান থেকে দণ্ড চুম্বকটি মাঝখানে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও যেন চুম্বকটি ভূসমান্তর ভাবে থাকে ও সুতোর চারদিকে সহজে ঘুরতে পারে।

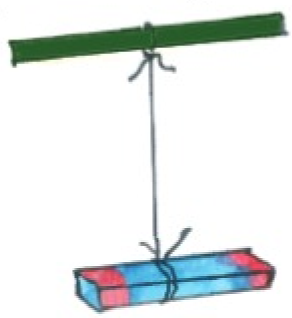

চিত্র১৩.৭ চুম্বক দ্বারা দিকনির্ণয়

এবার টেবিলের উপরে একটি ইট রেখে দণ্ড চুম্বকটি সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দাও, দেখবে চুম্বকটি যেন ভূসমান্তরভাবে ঝুলে থাকে। চিত্র ১৩.৮ দেখো।

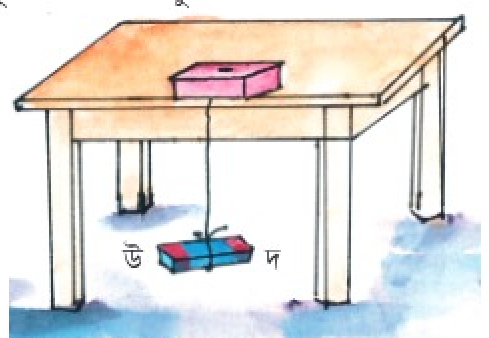

চিত্র ১৩.৮ দিগ্‌দর্শী দণ্ড চুম্বক।

দণ্ড চুম্বকটি কিছুক্ষণ ঘোরার পরে উত্তর-দক্ষিণ মুখে স্থির হয়ে থাকবে। এখন লাঠিটি একটু ঘোরানোর পর পুনরায় টেবিলের উপরে ইটের তলায় চেপে রাখো। দেখবে কিছু সময় পরে চুম্বক ঠিক আগের মতো উত্তর-দক্ষিণ দিকে স্থির হয়ে যাবে। তুমি দেখবে, চুম্বকের একটি নির্দিষ্ট মেরু সর্বদা উত্তর দিকে ও অন্য মেরুটি সর্বদা দক্ষিণ দিকে রয়েছে। চুম্বকের একদিকে তোমার দেওয়া চকের দাগ থেকে তা জানতে পারবে।

দণ্ড চুম্বকের যে নির্দিষ্ট মেরুটি উত্তর দিকে থাকে তাকে উত্তর সন্ধানী মেরু বা সংক্ষেপে উত্তর মেরু বলে। তেমনি যে নির্দিষ্ট মেরুটি দক্ষিণ দিকে থাকে তাকে দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা সংক্ষেপে দক্ষিণ মেরু বলে।

অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক ও সূচী চুম্বকের মতো অন্য ধরনের কৃত্রিম চুম্বক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখো। এখন তুমি জানলে যে চুম্বকের একটি দক্ষিণ মেরু ও একটি উত্তর মেরু থাকে। চুম্বকের এই প্রকার দিক সূচক ধর্ম বহুকাল থেকে দিকনির্ণয়ের জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে। সূচী চুম্বকের সাহায্যে নির্মিত দিকনির্ণয়কারী কম্পাস জাহাজের যাতায়াতের জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

তুমি হয়তো জানতে চাইবে চুম্বক ছাড়া দিকনির্ণয়কারী অন্য বস্তু আছে কি? এজন্য পেনসিল, স্কেল, লোহার পেরেক প্রভৃতি বস্তু নিয়ে চুম্বকের মতো ঝুলিয়ে দিকনির্দেশাত্মক ধর্ম বিষয়ে পরীক্ষা করো। বন্ধুদের সঙ্গে ও মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আলোচনা করো।

১৩.৬ চুম্বকীয় মেরুদের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ।

চুম্বকের দুপ্রকার মেরুর কথা তুমি জেনেছ। প্রশ্ন হল, দুটি চুম্বককে যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তাহলে মেরুগুলি পরস্পরের প্রতি কেমন আচরণ করবে? এসো, পরীক্ষা করে দেখি।

তোমার কাজ: ৫

দুটি দণ্ড চুম্বক নিয়ে আগের মতো ওদের মধ্যে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু চিহ্নিত করো। চক দিয়ে উত্তর মেরুর দিকে N ও দক্ষিণ মেরুর দিকে S লেখো। একটি দণ্ড চুম্বককে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রাখো।

(ক) দ্বিতীয় দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুকে ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে নিয়ে এসো। কী দেখতে পারছ? দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুর দিকে টানছে কি? তুমি যা দেখলে তা চিত্র (ক)-তে তিরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

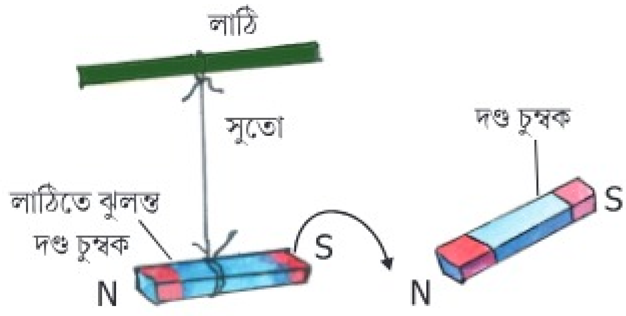

(খ) এবার দ্বিতীয় দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুকে ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর নিকটে নিয়ে এসো। ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু দ্বিতীয় দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর দিকে আকর্ষিত হয়ে এগিয়ে আসছে কি না দেখো। যা দেখছ তির চিহ্ন দিয়ে (খ) চিত্রে তা দেখানো হয়েছে।

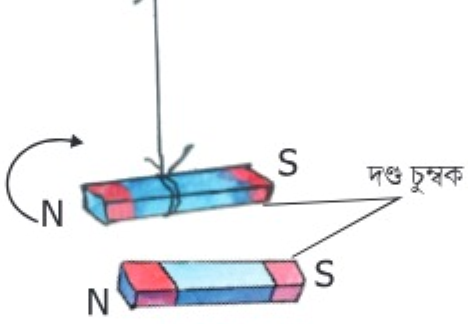

চিত্র ১৩.১০ চুম্বকীয় বিকর্ষণ।

(গ) দ্বিতীয় দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে আনো। যা দেখছ তির চিহ্ন দিয়ে চিত্র (গ)-তে দেখাও।

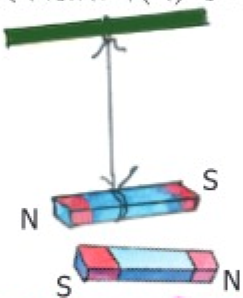

চিত্র ১৩.১১ চুম্বকীয় আকর্ষণ

(ঘ) দ্বিতীয় দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আনলে কী হয় তির চিহ্ন দিয়ে (ঘ) চিত্রে দেখাও।

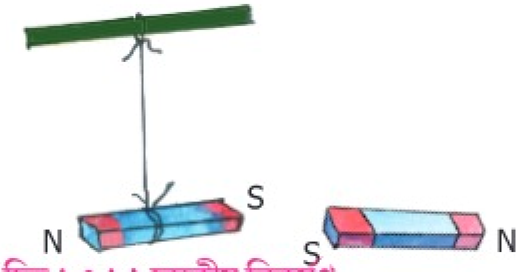

চিত্র ১৩.১২ চুম্বকীয় বিকর্ষণ

ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের বদলে সূচী চুম্বকটি নিয়ে উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি আরও একবার করো। এই পর্যবেক্ষণ গুলি আগের পর্যবেক্ষণের মতো কি না সহপাঠী ও মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করো।

উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে তুমি জানতে পারবে যে দুটি চুম্বকের সমান মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে ও অসমান মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

১৩.৭ চুম্বকের ব্যবহার

দিক নিরুপণের জন্য চুম্বকের ব্যবহারের কথা জানলে। লোহার গুঁড়োর সঙ্গে অন্য বস্তু মিশে গেলেও চুম্বক দ্বারা লোহাকে আলাদা করা যায়। ছোট ছুঁচ বা আলপিন নীচে পড়ে গেলেও চুম্বকের সাহায্যে খোঁজা সহজ। কিছু আলমারি ও রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ করার জন্য চুম্বক ব্যবহার করা হয়। কিছু ব্যাগ ও চুম্বকীয় বোতাম দ্বারা বন্ধ করা যায়। কিছু কিছু খেলনার মধ্যেও চুম্বক লাগানো থাকে। চুম্বক দিয়ে তুমিও কিছু মনোরঞ্জক খেলনা তৈরি করতে পারো। বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর, ভারী লোহা জাতীয় বস্তু ইত্যাদি ওঠানোর জন্য ক্রেন প্রভৃতি যন্ত্রপাতিতে চুম্বক ব্যবহার করা হচ্ছে। বাড়িতে চুম্বক থাকলে তা টেলিভিশন, কম্পিউটার, ক্যাসেট, সিডি প্রভৃতির কাছে রাখবে না, নচেৎ সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিছু যন্ত্র ভিতরের স্ক্রু, চুম্বকীয় স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে খোলা যায় বা লাগানো যায়।

তোমার দেখা যন্ত্রপাতি যাতে চুম্বকের ব্যবহার হয়, তার একটা তালিকা তোমার খাতায় করো।

কী শিখলাম ?

- চুম্বক প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুই শ্রেণীর পাওয়া যায়।
- প্রাকৃতিক চুম্বকের নির্দিষ্ট আকৃতি না থাকলেও কৃত্রিম চুম্বকের নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে, যথা দণ্ড চুম্বক, অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক, সূচী চুম্বক ইত্যাদি।
- চুম্বক লোহা, নিকেল, কোবাইট ও ইস্পাত প্রভৃতি আকর্ষণ করে। এদের চুম্বকীয় বস্তু বলা হয়। চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় না এমন বস্তুকে অচুম্বকীয় বস্তু বলে। সব ধাতু চুম্বকীয় নয়।
- প্রাকৃতিক চুম্বকে লোহা পাথর থাকলেও কৃত্রিম চুম্বক চুম্বকীয় বস্তু থেকে তৈরি হয়।
- চুম্বকে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু নামে দুটি মেরু থাকে।
- চুম্বকের দিক নির্ণায়ক ধর্ম হেতু তাকে ঝুলিয়ে রাখলে উত্তর, দক্ষিণ দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে।
- কম্পাস এক স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত চুম্বক ভিত্তিক যন্ত্র যাহার সাহায্যে দিক নিরুপণ করা যায়।
- দুটি চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ ও বিষম মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

অভ্যাস

১. শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) কৃত্রিম চুম্বকের একটি উদাহরণ হল ——— ।

(খ) প্রাকৃতিক চুম্বকে লেগে থাকা লোহাপাথরের নাম ———- ।

(গ) সূচী চুম্বকের মেরু সংখ্যা ——— ।

(ঘ) দণ্ড চুম্বকের আকর্ষণ মাঝের অংশ অপেক্ষা মেরুর কাছে ——— ।

২. ভুল থাকলে সংশোধন করে লেখো ও সংশোধিত উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদন করো।

(খ) চুম্বকের আকৃতি চ্যাপটা হয় না।

(খ) সীসা একটি অচুম্বকীয় বস্তু।

(গ) একটি চুম্বকের মেরু দুটি সমান।

(ঘ) অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দিকনির্ণায়ক গুণ থাকে না।

৩. দুটি সমান আকৃতির দণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো বস্তু এমনকি একটুকরো সুতোও নেই। দুটি দণ্ডের মধ্যে কোন্‌টি লোহার দণ্ড, কীভাবে তা নির্ণয় করবে লেখো।

৪. চুম্বকের ধর্মগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৫. যে দণ্ড চুম্বকের মেরুগুলির চিহ্ন দেওয়া হয়নি তার দক্ষিণ মেরুকে চেনার উপায় কী?

৬. ১৮ সেমির একটি দণ্ড চুম্বককে কেটে দু'টুকরো করা হল। একটি খণ্ডের লম্বা ১২ সেমি ও অন্যটির ৬ সেমি। নিম্নোক্ত বাক্যগুলি ঠিক কি ভুল প্রতিপাদন করো।

(ক) ১২ সেমি ও ৬ সেমি লম্বা দু'টুকরোতেই একটি করে মেরু থাকবে।

(খ) ১২ সেমি টুকরোতে দুটি মেরু ও ৬ সেমি টুকরোতে একটি মেরু থাকবে।

(গ) ১২ সেমি টুকরো দণ্ডটির মেরুর শক্তি ৬ সেমি দণ্ডের মেরুর শক্তির দুই গুণ বেশি।

(ঘ) দুটি টুকরোতে দুটো করে মেরু থাকবে।

বাড়িতে বসে করো:

- বিভিন্ন আকৃতির চুম্বক সংগ্রহ করে বিজ্ঞান মেলাতে প্রদর্শন করো।
- দিকনির্ণয়ের জন্য কার্যকর একটি মডেল প্রস্তুত করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী

তুমি খবর কাগজ, রেডিও ও টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ষা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, ঝড় ও ভূমিকম্পের মতো অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার কথা শুনেছ ও এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতাও কিছু রয়েছে। এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ তথা সরকার অনেক উপায় অবলম্বন করে। তোমাদের মধ্যে অনেকে ১৯৯৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ের কথা জানো। ২০১৩ ফাইলিন ও ২০১৪ হুড়হুড় বাত্যা-বিভীষিকার সম্মুখীন হয়েছ নিজে। তুমিও বড় হয়ে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ জেনে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারবে। কিন্তু তোমার অতীত অপরিচিত বর্ষা, মেঘগর্জন ও বজ্রবিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা বিষয়ে এসো কিছু আলোচনা করা যাক।

চিত্র ১৪.১ মেঘগর্জন ও বৃষ্টি

উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে যে বৃষ্টিতে লোকেরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। শিশুরা বিদ্যুৎ চমকানো দেখে চমকে উঠছে ও মেঘের গম্ভীর গর্জনে ভয় পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমরা সকলেই মেঘগর্জন ও বিদ্যুতের চমকানিকে ভয় পাই। বৃষ্টি কেন হয়? বৃষ্টির সময় বা তার পূর্বে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ-স্ফুরণ কেন হয় এসো জেনে নিই।

১৪.১ বাষ্পীভবন

তুমি জানো, ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দিলে কিছুক্ষণ পরে তা শুকিয়ে যায়। গরম তরকারি বাটিতে খাওয়া অপেক্ষা থালায় ঢেলে খেলে সুবিধা হয়। মাটিতে পড়ে যাওয়া জল কিছুক্ষণ পরে শুকিয়ে যায়।

চিত্র ১৪.২ সূর্যালোকে কাপড় শুকানো।

উপরের ছবিতে দেখো, ভিজে কাপড়চোপড়ের উপরে সূর্যালোক পড়াতে তা শুকিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির পরে রাস্তা, বাড়ির ছাদের উপরে জমে যাওয়া জল প্রভৃতি কিছু সময় পরে শুকনো হয়ে যায়। এ বিষয়ে আরও জানার জন্য এসো একটা কাজ করি।

তোমার কাজ: ১

তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু রুমাল সংগ্রহ করো। ওগুলো জলে ভিজিয়ে নাও। একটি ভিজে রুমাল মুড়ে গোলকোরে রাখো। অন্যটি সুতো বা তারে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। একটি রুমাল ঘরের ভিতরে অন্যটি ঘরের বাইরে টাঙাও। একটি রুমাল ফ্যানের নীচে ঝুলিয়ে দাও। যা দেখলে, বন্ধুদের সঙ্গে ও মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আলোচনা করো।

নিজে নিজে বাষ্প হয়ে জল বায়ুমণ্ডলে মিশে যাওয়াকে বাষ্পীভবন বলে। গরম জল ইত্যাদি থেকে নির্গত ধোঁয়ার মতো জিনিসকে জলীয় বাষ্প বা জলকণা বলা হয়।

বায়বীয় পদার্থে তাপমাত্রা বাড়লে, সূর্যকিরণ পড়লে বায়ুসঞ্চালিত হলে বাষ্পীভবন অধিক মাত্রায় বেগবান হয়। এই প্রক্রিয়ায় নদী, নালা, পুকুর, হ্রদ ও সমুদ্রের জল জলীয় বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে ঘোরে। এই বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া জলাধারের পৃষ্ঠভাগে সংগঠিত হয়।

১৪.২ বাষ্পীকরণ

তোমার কাজ: ২

একটি কাচের বাল্ব বা পাত্র নাও। এই পাত্রে একটু জল ঢালো ও একটু নুন দাও। একটি স্যান্ড বা চিমটার সাহায্যে সেটি ঝুলিয়ে রাখো। তার নীচে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে গরম করো তখন কী দেখবে? একটু পরে জল গরম হয়ে বাষ্প হয়ে উঠছে। এই বাষ্প বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে ও নুন নীচে রয়ে গেছে।

চিত্র ১৪.৩

যে প্রক্রিয়ায় জল গরম করে বাষ্প বা সূক্ষ্ম জলকণা সৃষ্টি করা হয় তাকে বাষ্পীকরণ বলা হয়। রান্নার সময়, কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল থেকে জল এই প্রক্রিয়ায় জল বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ায় জল থাকা পাত্রে জল গরম হয়ে জলকণাগুলি নির্গত হয়ে ধোঁয়ার মতো উপরের দিকে উঠে।

১৪.৩ বাষ্পীমোচন

তোমরা জেনেছ উদ্ভিদ তার যে খাদ্য তৈরি করে সেজন্য জলের দরকার হয়। শিকড়ের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি থেকে জল টেনে নেয়। আহার ও অন্যান্য কাজের জন্য উদ্ভিদ কিছু জল বিনিয়োগ করে। বাড়তি জল উৎস্বেদন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে।

তোমার কাজ: ৩

তোমার বিদ্যালয়ের বাগান থেকে একটি ফুলের টব নিয়ে এসো। ওই টবে একটু জল দাও। টবের উপরে গাছের চারদিকে ভালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও। যদি তোমার বিদ্যালয়ে থাকে, ফুলগাছটি

ঢেকে দাও। তা যদি না থাকে যেকোনো বড় কাচের পাত্রে ঢেকে দিয়ে রোদে রাখো। দু-তিন ঘণ্টা পরে দেখো। কী দেখলে? কাচের পাত্রে জল এল কী করে? যে প্রক্রিয়াতে গাছ অগ্নি তাপে স্ফীত জল ছাড়ে তাকে উৎস্বেদন (Transpiration) বলে। এভাবে উদ্ভিদের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল জলীয় বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

১৪.৪ ঘনীকরণ

তোমার কাজ: ৪

নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো পাত্রের মতো একটি বড় পাত্রে একটু জল নাও। অন্য একটি ছোট পাত্রে কিছু তুলো নিয়ে ছোট পাত্রটি বড় পাত্রের জলের ভিতরে অর্ধেক ডুবিয়ে রাখো। বড় পাত্রের মুখটি জরিতে বেঁধে তার উপরে একটি ছোট পাথর রাখো। কিছুক্ষণ পরে বড় পাত্রের মুখ খুলে ছোট পাত্রের তলাতে হাত দাও। হাত ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে কেন?

চিত্র ১৪.৫ ঘনীকরণ পরীক্ষা

বড় পাত্রে জল বাষ্পীভবন প্রণালীতে উপরে উঠে পাত্রের মুখে বাঁধা জরিতে ঠেকল এবং জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে ছোট পাত্রে তুলার উপরে পড়াতে তা ভিজল।

গ্যাসীয় পদার্থ ঠাণ্ডা হলে তা তরল পদার্থে পরিণত হয়। যে প্রণালীতে গ্যাসীয় পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয় তাকে ঘনীকরণ বলে। জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে জলে পরিণত হয়। ঘনীকরণ বাষ্পীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া। পরের পৃষ্ঠায় ঘনীকরণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তোমার জানা অন্য কয়েকটি উদাহরণ তোমার খাতায় লেখো।

— জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হলে মেঘে পরিণত হয়।

— শীতকালে ঘাসে শিশির পড়ে।

১৪.৫ জলের বিভিন্ন অবস্থা

তুমি নিশ্চয় আইসক্রিম খেয়েছ? এটি কীসে তৈরি হয় জানো? মাছ বিক্রেতার মাছ সজীব রাখার জন্য কী দরকার হয়? দুটোতেই বরফ দরকার। সরবতে বরফ দেওয়া হয়। মাংসপেশীতে আঘাত লাগলে বরফ ঘসা হয়। বরফ কোথায় পাওয়া যায়? বাজার থেকে কিনতে হয় বা নিজে তৈরি করতে পারো। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে বরফ পড়ে। তোমার বাড়িতে যদি রেফ্রিজারেটর থাকে তবে তার ভিতরে জল রেখে বরফ তৈরি করতে পারো। বরফ হল জলের কঠিন অবস্থা।

চিত্র ১৪.৬

তোমার ঘরে রান্নার সময় হাঁড়ি বা রান্নার বাসনপত্রের উপরে তাকাও, দেখো, উপরের দিকে কী উঠছে? উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বা ভাপ। জল গরম হলে তা ফুটে উঠে ও তা থেকে ভাপ বেরোয়। ইড্‌লি তো ভাপে তৈরি হয়। ডাক্তারখানার যন্ত্রপাতি গরম জলের বাষ্পতে নির্বীজিত (Sterilize) করা হয়। ভাপ জলের গ্যাসীয় অবস্থা।

চিত্র ১৪.৭

জল তিন অবস্থায় পাওয়া যায়। বরফ, জলের কঠিন অবস্থা। কিছু মহাসাগর, মেরুঅঞ্চল, পর্বতের শৃঙ্গ বরফাবৃত। জলের রূপ তরল, নদী, নালা, পুকুর সব জলে পরিপূর্ণ। জলীয় বাষ্প (ভাপ) জলের গ্যাসীয় অবস্থা। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প থাকে। রান্নার সময় ও কারখানা প্রভৃতি থেকে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে মেশে।

১৪.৬ জলচক্র

তাহলে তোমরা জানলে বাষ্পীভবন প্রণালীতে নদী, নালা, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল জলীয় বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। রান্নাঘর, কলকারখানার জল বাষ্পীকরণ প্রণালীতে জলীয় বাষ্প বা জলকণা আকারে বায়ুমণ্ডলে যায়। উদ্ভিদের আহার ও বড় হওয়ার জন্য জলের দরকার এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল বাষ্পীভবন বা উৎস্বেদন প্রণালীতে জলীয় বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে। তবে কি আমরা বুঝব, বিভিন্ন উপায়ে জলীয় বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে যে জল তা কি চিরদিনের জন্য হারাচ্ছি? নাকি আমরা তা জলের আকারে পুনরায় ফিরে পাচ্ছি।

তুমি তো জানো, আমরা বায়ুমণ্ডলের যত উপরে যাব তত বেশি ঠাণ্ডা অনুভব করব। বায়ুমণ্ডলে খুব উঁচুতে এত ঠাণ্ডা যে সেখানের জলীয় বাষ্প জলীয় বিন্দুতে পরিণত হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ বেশি ঠাণ্ডা হলে জল হয়। বর্ষার আকারে সেই জল আবার ভূপৃষ্ঠে পড়ে। ভূপৃষ্ঠের জল জলীয় বাষ্প আকারে উপরে উঠে পুনরায় জলীয় বাষ্পগুলি ঠাণ্ডা হয়ে জল আকারে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে একে জলের চক্রাকার গতি বা **জলচক্র** বলে।

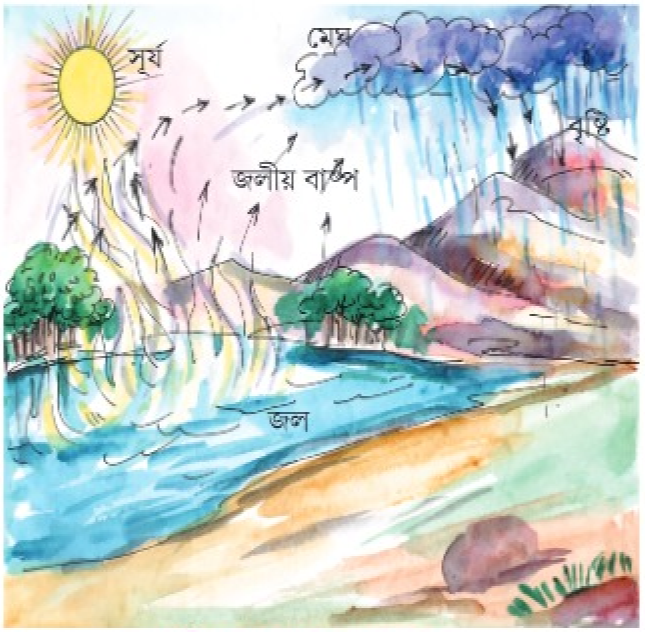

চিত্র: ১৪.৮ জলচক্র

১৪.৭ বর্ষা

তুমি জানলে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জল কীভাবে নানা প্রণালীতে জলীয় বাষ্প আকারে উপরে উঠে ও বায়ুমণ্ডলের ঠাণ্ডা স্তরের সংস্পর্শে এসে জলকণাতে পরিণত হয়। এই জলকণাগুলি বায়ুমণ্ডলের ঠাণ্ডা স্তরে একসঙ্গে মিশে মেঘে পরিণত হয়।

জলবিন্দুগুলি একত্র হলে তার আকার বেড়ে যায় ও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসে। একেই বৃষ্টি বলা হয়। কখনও কখনও বেশি মাত্রায় ঠাণ্ডা হলে জলকণাগুলি বরফে পরিণত হয়, সেজন্য বরফ বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ চমকায় ও মেঘগর্জন হয়।

১৪.৮ বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জন

তোমার কাজ: ৫

চারটি সেল যুক্ত একটি ব্যাটারি জোগাড় করো। ব্যাটারির যেদিকে যুক্ত মেরু (+) চিহ্ন থাকে সেদিকে একখণ্ড বিদ্যুৎ তারের এক মাথার অপরিবাহী অংশটি ছাড়িয়ে জুড়ে দাও তেমনি অন্যদিকে বিদ্যুতের তার নিয়ে ব্যাটারির যেদিকে বিযুক্ত মেরু (-) চিহ্ন থাকে সেদিকে জুড়ে দাও। বিদ্যুৎ তারের অন্য দুটি মাথা খুব পাশাপাশি ধরো। কী হয় দেখো। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা স্পার্ক দেখতে পাবে ও কড়কড় শব্দ শুনতে পাবে। রাস্তার বিদ্যুতের খুঁটিতে বা ঘরের মিটার বাক্সের কাছে কখনও যদি মুখ খোলা বিদ্যুতের তার একসঙ্গে হয়ে যায়, তবে সে জায়গায় স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাবে ও চড়চড় শব্দ শুনতে পাবে। গাড়ির প্লাগ পরিষ্কার করার সময়েও স্পার্ক দেখতে পাবে ও শব্দ শুনতে পাবে। সাধারণত বায়ুমণ্ডলে মেঘের জলবিন্দুগুলি দুভাবে চার্জ বা বৈদ্যুতিক শক্তি লাভ করে। মেঘে কখনও যুক্ত চার্জ (+)-এর জলকণা ও অন্য কখনও মেঘে বিযুক্তাত্মক (-) জলকণা থাকে। সাধারণত ঝড়ের সময় যখন প্রচণ্ড বেগে হাওয়া বইতে থাকে তখন বিষম চার্জ বিশিষ্ট মেঘ প্রবল বেগে নিজে নিজের নিকটবর্তী হয়। বিষম চার্জযুক্ত টুকরো টুকরো মেঘগুলোর মধ্যে আকর্ষণের ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই বিষম চার্জযুক্ত অলাদা আলাদা মেঘগুলো নিকটতর হওয়ার দরুন স্পার্ক হয়। এর ফলে প্রভূত পরিমাণে আলো ও শব্দ সৃষ্টি হয়।

মেঘে যে স্পার্কের সৃষ্টি হয় তাকে বিদ্যুৎ ও শব্দকে মেঘগর্জন বলে। আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে বেশি। এজন্য মেঘে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জন একসঙ্গে সৃষ্টি হলে মেঘবহ্নি দেখার কিছু সময় পরে মেঘগর্জনের শব্দ শোনা যায়। বজ্রাগ্নিতে জীবনহানির খবর শুনেছ নিশ্চয়। তবুও বিদ্যুৎ যে জীবজগতের অশেষ উপকার করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কী শিখলাম ?

- বন্যা, খরা, ঝড়-তুফান প্রভৃতি যেমন প্রাকৃতিক ঘটনা, বর্ষা, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা।
- জল যখন বাষ্পে পরিণত হয় সেই বায়বীয় পদার্থকে বাষ্পীভবন আর জল গরম হয়ে যখন ধোঁয়ার মতো নির্গত হয় সেই ভাপকে বাষ্পীকরণ বলা হয়।
- গাছ মাটি থেকে জল শোষণ করে বাড়তি জল বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে একে বাষ্পীকরণ বা উৎস্বেদন বলা হয়।
- গাছপালা, জঙ্গল, মেঘসৃষ্টি এবং বৃষ্টিপাতের সহায়ক।
- বাষ্পীভবন ও বাষ্পীকরণ পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া। বাষ্পীকরণ ও বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার ফলে বৃষ্টি ও জলাবর্তের সৃষ্টি হয়।
- বিপরীত চার্জযুক্ত মেঘমালা পরস্পর সম্মুখবর্তী হলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়।

অভ্যাস

১. নীচের বাক্যগুলি পড়ো। খাতায় লিখে ঠিক বাক্যের পাশে টিক (✓) চিহ্ন ও ভুল বাক্যের পাশে ক্রস (×) চিহ্ন দাও।

(ক) জল সব জায়গাতে তরল অবস্থায় পাওয়া যায়।

(খ) ভিজে কাপড় বাষ্পীভবন প্রণালীতে শুকোয়।

(গ) পুকুরের জল বাষ্পীমোচন প্রণালীতে জলীয় বাষ্প হয়।

(ঘ) ভূগর্ভস্থ জল বাষ্পীমোচন প্রণালীতে জলীয় বাষ্প হয়।

(ঙ) পাখার নীচে কাপড় শুকোতে দিলে তাড়াতাড়ি শুকোয়।

২. বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) আইসক্রিম জলের ——— অবস্থা। (কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, প্লাজমা)

(খ) জল নিজেই জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়াকে —— প্রক্রিয়া বলে। (বাষ্পীমোচন, বাষ্পীকরণ, বাষ্পীভবন, উৎস্বেদন)

(গ) শীতকালে পুষ্করিণীর জল থেকে উপরে ওঠা জলীয় বাষ্প জলের ——— অবস্থা। (কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, কিছু নয়)

(ঘ) আকাশের বিদ্যুৎ চমকানো ——— প্রক্রিয়া। (ভৌতিক, আকস্মিক, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক)

(ঙ) গাছ ———র জল ব্যবহার করে। (ভূপৃষ্ঠ, ভূঅভ্যন্তর, বায়ুমণ্ডল, বৃষ্টি)

৩. কারণ লেখো।

(ক) সমুদ্রের জল প্রায় শেষ হয় না।

(খ) বর্ষাকালে কাপড় শুকোতে দেরি হয়।

(গ) গরম তরকারি প্লেটে খেতে সুবিধা।

৪. বাঁদিকে সামঞ্জস্য দেখে দক্ষিণ দিকের শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) কাপড় শুকনো করা: বাষ্পীভবন:: জলীয় বাষ্প জল হওয়া —

(খ) বরফ: কঠিন:: ভাপ —

(গ) মেঘগর্জন: শব্দ:: বিদ্যুৎ —

৫. 'ক' লাইনের শব্দকে 'খ' লাইনের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে অর্থসূচক বাক্য গঠন করো।

'ক' লাইন —বাষ্পীভবন, ঘনীকরণ, বাষ্পীমোচন, জলাবর্ত

'খ' লাইন—গাছ, বরফ, ভাপ, সমুদ্রের জল, করকা

৬. চারটি মহাসাগর, এত নদী, নালা, পুকুর রয়েছে তবু সকলে বলে জঙ্গল কেটে দেওয়াতে বৃষ্টি কম হচ্ছে, এ ধারণার কারণ লেখো।

বাড়িতে বসে করো:

● ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, মশারির কাপড়ের টুকরো, পলিস্টার কাপড়ের টুকরো, পশম কাপড়ের টুকরো জোগাড় করো।

● প্রত্যেকটি কাপড়ের টুকরো জলে ভিজিয়ে চিপড়ে নাও। তারপরে ওগুলো একটি টেবিলের উপরে বা উঠোনে বিছিয়ে দাও। কোন্ কাপড়ের টুকরো কতক্ষণ পরে শুকোচ্ছে তা লেখো। এবার কাপড়ের টুকরো ও শুকনোর সময়ে এক তালিকা তৈরি করো। এখন বলো কোন্ টুকরোটি ঘর বা ডাইনিং টেবিল মোছার জন্য উপযুক্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায় আলোক

তুমি দিনের বেলায় রাস্তায় যাতায়াতের সময় তোমার চারদিকে কত জিনিস দেখতে পাও। গাড়ি, মোটর, সাইকেল, গাইগরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ, গাছপালা, ফুল, ফল ইত্যাদি। কিন্তু সেই রাস্তায় অন্ধকার রাত্রে গেলে এসব দেখতে পাবে কি?

তোমার ঘরের ভিতরে তুমি টেবিল, চেয়ার, বইপত্র, জামাকাপড়, কাঁসার বাসনপত্র প্রভৃতি কত জিনিস দেখেছ। কিন্তু রাত্রে আলো নিভে গেলে সেগুলো কী দেখতে পাবে? লম্ফ, লণ্ঠন, মোমবাতি জ্বালালে কিংবা বিদ্যুতের আলো জ্বালালে বা অন্য কোনো উপায়ে আলোর ব্যবস্থা করলে এগুলো দেখতে পাবে।

অন্ধকার ঘর অলৌকিক ঘর

চিত্র: ১৫.১ আলোক ও অন্ধকার

আলো বিভিন্ন পদার্থ দেখতে সাহায্য করে।

কোনো বস্তুর উপরে আলো পড়লে আমরা তা দেখতে পাই। সূর্য, তারা, মোমবাতি, টর্চ, ইলেকট্রিক বাল্ব প্রভৃতি উজ্জ্বল বস্তু। এগুলো আলোর উৎস। কিন্তু টেবিল, চেয়ার, বইপত্র, খাট ইত্যাদি উজ্জ্বল বস্তু বা আলোর উৎস নয়।

তুমি কি জানো?

Street Light ও Reflector

প্রতিফলকের চিত্র

- রাস্তার আলোর খুঁটি (Street Light) ও আলোর এক উৎস যা রাত্রে সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে।
- এই বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব অনেক উঁচুতে থাকলেও সবকিছু জিনিস স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই আলোতেও বস্তুর ছায়া সৃষ্টি করে না, তার ফলে রাস্তা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

১৫.১ স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, অল্প স্বচ্ছ পদার্থ

তোমার কাজ: ১

তোমার চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা কিছু বস্তু সংগ্রহ করো। কাগজ, ব্যাগ, বাক্স, কাচের প্লেট, স্লেট, খাপড়া, নোটবই, পিচবোর্ড, রঙিন কাগজ, তেললাগা কাগজ প্রভৃতি। প্রত্যেক বস্তু একটির পর একটি ধরে তার ভিতর দিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির দিকে তাকাও।

চিত্র ১৫.২ স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ বস্তু

কী দেখলে? কয়েকটি বস্তু দিয়ে মোমবাতি দেখা যাচ্ছে, আর কতকগুলি দিয়ে মোমবাতি আদৌ দেখা যায়নি। আবার কতকগুলিতে মোমবাতি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। নীচের সারণীটি পূরণ করো।

সারণী ১৫.১ বিভিন্ন প্রকার বস্তুর ভিতর দিয়ে আলোক

পদার্থ	মোমবাতি দেখা যাচ্ছে	মোমবাতি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে	মোমবাতি একেবারেই দেখা যাচ্ছে না।
তৈলাক্ত কাগজ			
কাগজ			
কাচ			
খাপরা			
পাতলা প্লাস্টিক			

- যে পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো গতি করতে পারে সেগুলি স্বচ্ছ পদার্থ। যথা: কাচ, চশমা, জল ইত্যাদি।
- যে পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো মোটেই গতি করতে পারে না সেগুলি অস্বচ্ছ পদার্থ। যথা: খাপরা, কাগজ, পিচবোর্ড ইত্যাদি।
- যে পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো অল্পস্বল্প আসে তা ঈষৎ স্বচ্ছ পদার্থ। যথা: পাতলা প্লাস্টিক, তৈলাক্ত কাগজ ও রঙিন কাগজ ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত পদার্থগুলিতে এই সব গুণ সম্বন্ধে তোমরা পড়েছ।

১৫.২ আলোর গতি

তোমার ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে ছোট ছিদ্র দিয়ে ভিতরে আসা আলোর গতিপথের দিকে তাকাও। পাকা বাড়ির স্কাইলাইট বা জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে আসা আলোর গতিপথের দিকে তাকাও।

রাতের বেলায় গাড়ি থেকে আসা আলোর দিকে তাকাও। তোমার টর্চ জ্বলাও। ওই টর্চ থেকে যে আলো বেরোচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে তা দেখো। এ সবের মধ্যে তুমি কী দেখলে?

- আলোর উৎস থেকে আলো সব দিকে সরলরেখায় গতি করে। একে **আলোক রশ্মি** বলে।
- রশ্মিসমূহকে আলোকগুচ্ছ বলে। টর্চ ও গাড়ি থেকে এই আলোকগুচ্ছ বেরোয়।

তোমার কাজ: ২

একটি প্লাস্টিকের নল জোগাড় করো। টেবিলের উপরে একটি মোমবাতি জ্বেলে রাখো। টেবিলের উলটো দিক থেকে ওই সোজা নল দিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার দিকে তাকাও। মোমবাতির শিখা দেখলে তো? নলটি সামান্য বাঁকাও।

প্লাস্টিকের নলের ভিতর দিয়ে আলো

এর পর বাঁকা নলের ভিতর দিয়ে মোমবাতির শিখাকে দেখো। শিখা কি দেখা যাচ্ছে? তুমি কী ভাবছ?

সোজা নল দিয়ে আলো দেখা গেল কিন্তু বাঁকানো নল দিয়ে দেখা গেল না। সুতরাং আলোর গতিপথ সরলরৈখিক।

তিনটি পিচবোর্ডে সমান উচ্চতায় ফুটো করে একটি মোমবাতির সাহায্যে এই পরীক্ষা করা যেতে পারে।

১৫.৩ ছায়া

তুমি রাত্রে আলোর সামনে বসে পড়ো ও লেখো। তুমি লেখার সময় তোমার হাত ও হাতের কলমের দিকে তাকাও। তোমার লেখা কাগজের উপরে কী দেখছ? দিনের বেলায় সূর্যের দিকে পিছন করে দাঁড়াও। তোমার সামনে মাটির উপরে তুমি কী দেখতে পাবে?

আলোর সামনে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে বস্তুর পিছন দিকে থাকে অন্ধকার একে বস্তুর ছায়া বলে। এই ছায়া মাটিতে বা একটি পর্দা উপরে পড়ে। এই ছায়ার আকার, আলোক, অস্বচ্ছ বস্তু ও পর্দার অবস্থানের উপরে নির্ভর করে।

তোমার কাজ: ৩

তোমার শ্রেণীগৃহের দরজা, জানালা বন্ধ করে গৃহটি অন্ধকার করো। একটি মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের উপরে রাখো। এর পর মোমবাতির সামনে লম্বাভাবে একটি ইট রাখো। তারপরে একটি সাদা পিচবোর্ড হাতে নিয়ে ইটের পিছনে ধরো। সাদা পিচবোর্ডের উপরে ইটের ছায়া লক্ষ করো। ইটটিকে মোমবাতির শিখার দিকে নিয়ে এসো ও ছায়াকে দেখো। শিখা থেকে ইটটি দূরে সরিয়ে নাও ও ছায়ার দিকে তাকাও।

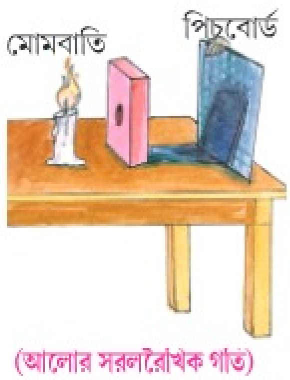

(আলোর সরলরৈখিক গতি)

আবার মোমবাতি ও ইটটি না নড়িয়ে বোর্ডটি সামনে পিছনে করে ছায়াটি দেখো। কী দেখলে? ইটটি মোমবাতির যত কাছে আনছ বোর্ডের উপরে ছায়ার আকৃতি সেই অনুসারে বড় হচ্ছে। পিচবোর্ডকে ইট থেকে যত দূরে নিয়ে যাবে দেখবে ছায়ার আকৃতি তত বড় হয়ে যাচ্ছে এবং অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আলোর উৎস, অস্বচ্ছ বস্তু ও পর্দার অবস্থান অনুসারে ছায়ার আকৃতি ছোট, বড়, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হয়। আলোর পথ সরলরৈখিক হওয়ায় অস্পষ্ট পদার্থের ছায়া সৃষ্টি হয়।

১৫.৪ প্রতিফলন

তোমার মুখের সামনে একটি আয়না ধরো কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? তোমার মুখের প্রতিবিম্ব আয়নার ভিতরে দেখা যাচ্ছে। দর্পণের সামনে যে কোনো বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখা যাবে। পুকুরের ধারে গাছ, ঘর প্রভৃতির প্রতিবিম্ব পুকুরের জলে দেখতে পাবে। আয়না ও জল প্রভৃতি প্রতিফলনের পৃষ্ঠদেশ। এই পৃষ্ঠদেশে আলো পড়লে আলোর প্রতিফলন হয় ও প্রতিবিম্ব পড়ে।

চিত্র ১৫.৫
প্রতিফলনের পরীক্ষণ

প্রতিবিম্ব তৈরির জন্য এসো একটা সহজ উপায় বের করি।

১৫.৫ রন্ধ্র ক্যামেরা

তোমার কাজ: ৪

মোটা কাগজের দুটি লম্বা আকৃতির ঠোঙা নাও। যেন একটি ঠোঙা অন্য ঠোঙার ভিতরে ঢুকতে পারে। প্রত্যেক ঠোঙার একটি চওড়া দিক খোলা থাকবে। বড় ঠোঙার বন্ধের পাশে একটি ছোট্ট ছিদ্র করো। ছোট ঠোঙার বন্ধের পাশে বড় বড় রন্ধ্র করে তেল মাখা একটি কাগজ তাতে জড়িয়ে দাও। বড় ঠোঙার খোলা মুখে ছোট ঠোঙার খোলামুখ ঢুকিয়ে দাও। এটি তোমার রন্ধ্র ক্যামেরা। নীচে দেখানো চিত্র দেখো।

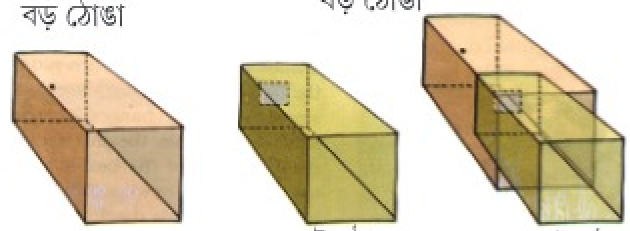

চিত্র ১৫.৬ রন্ধ্র ক্যামেরা

তোমার কাজ: ৫

তোমার তৈরি করা ক্যামেরার ছিদ্রের কাছে একটি চোখ রাখো। একটি কালো কাপড় দিয়ে তোমার মুখ ও ক্যামেরা ঢেকে দাও। কিছু দূরের গাছটি তোমার ক্যামেরায় দেখো। গাছের উপরে যেন সূর্যের আলো পড়ে। ছোট ঠোঙাটি সামনে পিছনে নাড়াচাড়া করে বড় ঠোঙার ছিদ্র দিয়ে গাছটি এমন ভাবে দেখো যাতে ছোট ঠোঙার তেলের কাগজের উপরে গাছের ছবি দেখা যায়। ভালো করে দেখো। এটা গাছের ছায়া নয়, এটি গাছের সোজা ও উলটো প্রতিবিম্ব। আলো এক সরল রেখায় গতি করে বলে রন্ধ্র ক্যামেরাতে বস্তুর সোজা ও উলটো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

তোমার কাজ: ৬

একটি পিচবোর্ড নাও। তার মধ্যে একটি ফুটো করো। ওই পিচবোর্ডটি সমতলভূমির সামান্য উপরে সূর্যের দিকে মুখ করে রাখো। পিচবোর্ডটি সমতলসহ সমান্তরালভাবে ধরো। সমতল উপরে কীসের ছবি পড়ছে দেখো।

সমতল উপরে পিচবোর্ডের ছায়া পড়ছে। ও মাঝখানে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। এখন ছায়া ও প্রতিবিম্ব কী বুঝলে তো?

তুমি কি জানো ?

- রাস্তার দুই দিকে ও সড়ক বিভাজকগুলিতে প্রতিফলকগুলি সাজানো থাকে। এই প্রতিফলকগুলি রাতের বেলায় যানবাহনগুলিকে রাস্তার উচ্চতা, গতিপথ ও কোন্ দিকে যেতে হবে সংকেতের সাহায্যে তা জানিয়ে দেওয়া হয়।
- গাড়ি চালকের সামনের দর্পণ (রিওর ভিউ দর্পণ) তার তৃতীয় নয়ন সদৃশ।
- পিছনে আসা যানবাহনগুলির নির্দিষ্ট দূরত্ব নিরুপণের এটি সাহায্য করে। এর ফলে গাড়ি চালকের পিছনে আসা গাড়িগুলির গতিপথ দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে ও নিরাপদে গাড়ি চালাতে সুবিধা হয়।

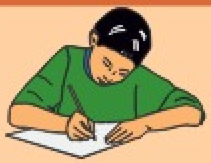

কী শিখলাম ?

- যে বস্তুর উপরে আলো পড়ে তা আমরা দেখতে পাই।
- যে পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে সেগুলি স্বচ্ছ পদার্থ।
- যে পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো দেখা যায় না সেগুলি অস্বচ্ছ পদার্থ।
- যে পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো একটু একটু যেতে পারে সেগুলি অল্প স্বচ্ছ পদার্থ।
- স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে আলো সহজে বিনা বাধায় গতি করে। অস্বচ্ছ হলে তার ভিতর দিয়ে আলো মোটেই যেতে পারে না, কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে আলোর গতি হয় অত্যন্ত ক্ষীণ।
- আলো এক সরলরেখায় গতি করে।
- আলোর সামনে অস্বচ্ছ বস্তু থাকলে বস্তুর পিছনে ছায়া সৃষ্টি করে।
- দর্পণ এক প্রতিফলন পৃষ্ঠ। এতে আমরা বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখি।
- আলোর পথ সরলরৈখিক হওয়ায় রন্ধ্র ক্যামেরাতে প্রতিবিম্ব পড়ে।

অভ্যাস

১. নীচের বাক্যগুলি পড়ো। খাতায় লিখে ঠিক বাক্যের পাশে টিক (✓) চিহ্ন ও ভুল বাক্যের পাশে ক্রস (✕) চিহ্ন দাও।

(ক) আলোর গতিপথ সরলরৈখিক নয়।

(খ) দর্পণ এক প্রতিফলন পৃষ্ঠ।

(গ) এরন্ড তৈল এক অস্বচ্ছ পদার্থ।

(ঘ) বস্তুর প্রতিবিম্ব তার ছায়া নয়।

(ঙ) নির্মল জল এক স্বচ্ছ পদার্থ।

২. বন্ধনী ভিতর থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) আলোর প্রতিফলন — পৃষ্ঠ উপরে হয়। (দর্পণ, লেন্স, প্রিজম)

(খ) পাতলা প্লাস্টিক একটি — পদার্থ। (স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, অল্প স্বচ্ছ)

(গ) আলোর উৎস স্থির রেখে পর্দাকে যত দূরে নেওয়া যায় ছায়ার আকৃতি তত — হয়। (ছোটো, বড়ো, অস্পষ্ট বড়ো)

৩. নিম্নোক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে দু-তিনটি বাক্যে পার্থক্য লেখো।

(ক) ছায়া ও প্রতিবিম্ব, (খ) স্বচ্ছ পদার্থ ও অস্বচ্ছ পদার্থ।

৪. আলোর গতি এক সরল পথে—দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৫. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) প্রতিবিম্ব সৃষ্টির জন্য কী কী দরকার?

(খ) অল্প স্বচ্ছ পদার্থ বলতে কী বোঝায়? দুটি উদাহরণ দাও।

(গ) ছায়া কীভাবে তৈরি হয়?

৬. আকাশে উড়ন্ত পাখির ছায়া কখনও ভূপৃষ্ঠে পড়ে তো কখনও পড়ে না। দু-তিন বাক্যে তার কারণ লেখো।

৭. রাস্তার ধারে আলোর খুঁটি দুর্ঘটনা এড়াতে কীভাবে সাহায্য করে?

৮. গাড়িচালকের সামনের দর্পণকে চালকের তৃতীয় নয়ন বলে বলা হয় কেন?

বাড়িতে বসে করো:

- তিনটি পিচবোর্ড একটি মোমবাতি নিয়ে আলো এক সরলরেখায় গতি করে দেখানোর জন্য পরীক্ষা করো।
- একটি চিরুনি, টর্চ ও দর্পণ নিয়ে ছায়া ও প্রতিবিম্ব গঠনের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তুত করো।

ষোড়শ অধ্যায়

জল

জীবনের সঙ্গে জলের নিবিড় সম্পর্ক। বেঁচে থাকা ও শরীরের বৃদ্ধির জন্য আমরা খাদ্য খাই ও জল খাই। শিশুরা দুধ খায়। দুধে জল থাকে। মাঝে মাঝে ডাবের জলও আমরা খাই। গ্রীষ্মকালে আমরা শসা ও তরমুজ বেশি পরিমাণে কেন খাই? গরমে আমাদের শরীর থেকে জলীয় অংশ কমে যায়। এই ফলগুলোতে বেশি পরিমাণে জল থাকায় সেগুলো খেলে শরীরে জলের অভাব পূরণ হয় শিগগির। অন্যান্য পশুপক্ষীরাও জলপান করে।

আমাদের রক্তে জল মুখ্য উপাদান। প্রত্যেক জীবকোষের অর্ধেকের চেয়েও বেশি জল রয়েছে বলেই সেগুলো সজীব ও কার্যক্ষম থাকে। অনেক অপ্রয়োজনীয় পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয়ে প্রস্রাব ও ঘামের মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শুধু যে খাওয়ার জন্য জল ব্যবহার করি তা নয়, আমাদের নানা কাজের জন্যও জল দরকার। যদি আমাদের চারপাশে জলের পরিমাণ হ্রাস পায় তবে আমাদের কী কী অসুবিধা হবে? তোমরা কী কী কাজের জন্য জল ব্যবহার করো তার একটি তালিকা করো।

চিত্র: ১৬.১ কুয়োর জলের নানা প্রকার ব্যবহার

১৬.১ জলের আবশ্যকতা

তোমার বাড়িতে প্রতিদিন কত পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয় তার আনুমানিক হিসাব নিম্ন সারণীতে লেখো। তুমি এই পরিমাণকে আনুমানিক কত গ্লাস, মগ কিংবা বালতিতে মাপতে পারবে।

সারণী ১৬.১ দৈনন্দিন কাজের জন্য আবশ্যক জলের আনুমানিক হিসাব

যে কাজে ব্যবহার করা হয় তার না	তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য কত জলের প্রয়োজন	তোমার বাড়ির প্রয়োজনে কত পরিমাণ জলের প্রয়োজন
খাওয়ার জন্য		
মুখ ধোওয়ার জন্য		
দাঁত মাজার জন্য		
শুচিতার জন্য		
স্নানের জন্য		

রান্নার কাজ		
বাসন ধোয়া		
কাপড় কাচা		
ঘর পরিষ্কার করা		
গাছে জল দেওয়া		
অন্যান্য কাজ		
মোট পরিমাণ		

উপরে বর্ণিত তালিকা থেকে আমরা আমাদের বাড়ির জন্য দৈনিক কত জল ব্যবহার করি তা জানতে পারি। অনুমান করে মগ বালতির বদলে তা আনুমানিক কত লিটার হতে পারে? অনুমান করো তুমি বছরে খাওয়ার জন্য কত জল দরকার বলে ভাবছ? তোমার পরিবারের মতো তোমার পাড়ায় কত পরিবার আছে? ওদের লোকসংখ্যা প্রায় কত? তোমার দৈনিক কত প্রয়োজন জানার পরে পাড়ার সকলের জন্য বছরে কত পরিমাণ জল দরকার তা তুমি অনুমান করতে পারবে।

মানুষের মতো অন্য জীবজন্তুদের জলের প্রয়োজন হয়। কুকুর, গরু, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীদেরও জল এক পানীয় পদার্থ। জলে মাছ, কচ্ছপ

চিত্র: ১৬.২ জলের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী

ইত্যাদি প্রাণী ও পদ্মের মতো উদ্ভিদও থাকে। তেমনি আবার বাগানের ফুলগাছেও আমরা জল দিই।

উদ্ভিদের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য প্রস্তুতের জন্য উদ্ভিদের জল একান্ত আবশ্যক। অঙ্গারকাম্ল ও জলের সংযোগেই তো শর্করা সৃষ্টি হয়। মাটিতে অণুজীবরা বড় হয়ে উঠে। যবক্ষরজানকে মাটিতে মেশানোর জন্য যে সব জীবাণুর সাহায্য প্রয়োজন, তাদেরও জলের প্রয়োজন হয়। জল এক দ্রাবক। তার দ্রবীকরণ গুণ রয়েছে। কাজেই মাটির ক্ষার অংশকে সে দ্রবীভূত করতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন মাটির জল ধারণ করবার শক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং মাটির চরিত্র বুঝে বিভিন্ন প্রকার ফসল চাষ করা হয়। এসো, এ কথা পরীক্ষা করে বুঝে নিই।

(ক) মাটির জলধারণ

তোমার কাজ: ১

কোন্ মাটির জল ধারণ করার শক্তি কত তা জানা প্রয়োজন। বেলে মাটি, পলি মাটি, চিটা মাটি—এই তিন প্রকার মাটির নমুনা সংগ্রহ করো। তিনটি প্লাস্টিকের

বোতল নাও। নীচের ছবিতে দেখানোর মতো তার উপরের অংশটি কেটে দাও। তা এক ফানেলের মতো কাজ দেবে।

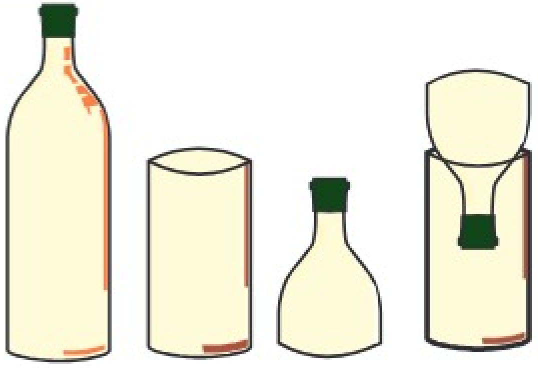

চিত্র: ১৬.৩ মাটির জলধারণ ক্ষমতা পরীক্ষণ প্রস্তুতি

বোতলের নীচের কাটা অংশটি একটি পাত্রের মতো কাজে লাগবে। বোতলের উপরের অংশটি নীচের অংশের উপরে উলটিয়ে রাখো। তিনটি ফানেলের ভিতরে তিন টুকরো কাপড় জড়িয়ে দাও। প্রত্যেকটিতে সমান পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন মাটি রাখো ও এর মধ্যে সম-পরিমাণ জল ঢালো। দশ-পনেরো মিনিট পরে দেখো। কোন্ পাত্রটিতে বেশি জল রয়েছে এবং কোন্ পাত্রটিতে সবচেয়ে কম জল রয়েছে। এবার তুমি বলো, কোন্ প্রকার মাটি বেশি জল ধরে রাখতে পারে এবং কোন্ প্রকার মাটির জল-ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম।

(খ) শিকড় দ্বারা জল শোষণ

মাটির লবণাক্ত জলে দ্রবীভূত হওয়ার ফলে যে দ্রবণ তৈরি হয় সেই দ্রবণ শিকড় শুষে নেয়।

তোমার কাজ: ২

শিকড়সহ একটি গাছ জোগাড় করো। শিকড়ে লেগে থাকা মাটি ধুয়ে নাও। একটি কাচের গ্লাসে জল নাও। এই জলে দুফোঁটা আলতা মেশাও।

চিত্র ১৬.৪ শিকড় দ্বারা জল শোষণ পরীক্ষণ।

দেখো জল লাল রঙের হয়ে গেছে। এই রঙিন জলে ফুলগাছের শিকড় ডুবিয়ে রাখো। দেখো, কী পরিবর্তন হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে লাল জল শিকড় থেকে কাণ্ড দিয়ে পাতায় যাচ্ছে। কারণ গাছের শিকড় এই জল শুষে নেয়।

(গ) পাতা থেকে জল মোচন

তোমার কাজ: ৩

দুটি পলিথিনের ব্যাগ নাও। বাগান থেকে পত্রসহ গাছের ডাল এনে ওই পলিথিন ব্যাগে ঢুকিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দাও। ১৫ মিনিট পরে দেখো।

চিত্র ১৬.৫ জল মোচন

কী দেখতে পাবে? পলিথিন ব্যাগের ভিতরে কিছু জলবিন্দু লেগে রয়েছে। এই জল গাছের পাতা দিয়ে বাষ্প আকারে বেরিয়ে পলিথিনে জমা হয়েছে। একে জলের উন্মোচন বা স্বেদন বলা হয়। উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা আমরা জানলাম যে, গাছ তার শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল শোষণ করে। এই জল ব্যবহার করে শ্বেতসার প্রস্তুত করে। শেষে জলের কিছু অংশ আবার বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

১৬.২ বন্যা

জলের উৎস নদী, পুকুর, কুয়ো—বর্ষাকালে এগুলি জলে স্ফীত হয়ে ওঠে। অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি হলে নদীতে জল বেড়ে যায়। তোমার গ্রাম বা শহরের কাছে নদী থাকলে দেখবে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর জল দুকূল ডুবিয়ে উপছে পড়ে। গ্রাম, চাষজমিতে জল ঢুকে যায়। জলের এই রূপকে আমরা বন্যা বলি। বন্যায় জলের স্রোতে গরু, ছাগল ও মানুষও ভেসে যায়। আমাদের রাজ্যে বন্যা এক প্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয়। মহানদীতে বন্যার জল আটকানোর জন্য হীরাকুদে বাঁধ

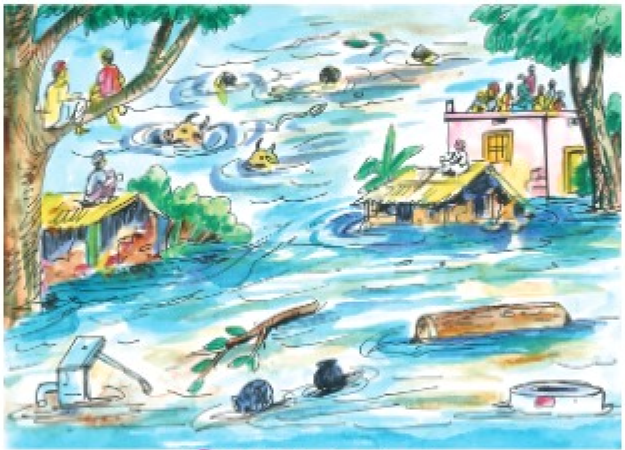

চিত্র ১৬.৬ বন্যাজল

বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এই নদীবন্ধ থেকে বেশি পরিমাণে জল হঠাৎ এককালীন ছাড়লে বন্ধ সংলগ্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। বন্যার পূর্বে ও বন্যার সময়ে তোমার কী প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, সে বিষয়ে আবশ্যকীয় সূচনা রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে দেওয়া হয়।

১৬.৩ খরা

প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে কী হয়? একনাগাড়ে অনিয়মিত ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষিকাজের জন্য যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তার অভাব ঘটে। বৃক্ষরাজি আবশ্যক পরিমাণে জল পায় না। ক্রমাগতভাবে অনেক দিন ধরে আমাদের দেশে বৃষ্টি না হলে জলের ঘোর অভাব দেখা দেয়। একে খরা বা অনাবৃষ্টি বলা হয়। ফলে পশুপক্ষীও জলের অভাবে মরে যায়।

জলের প্রকোপে সৃষ্টি নাশ, জলের অভাবে সৃষ্টি নাশ

১৬.৪ জল সংরক্ষণ

দিন দিন জলের ব্যবহার বাড়ছে। সাধারণভাবে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যত জল ব্যবহার করে তার পরিমাণ বেশি না হলেও কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি। এজন্য সমুদ্রের জল অনুপযুক্ত বলে বর্ষার জল ও ভূতল জলের সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক। ভবিষ্যতে জলের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যাবে, কারণ আমাদের জনসংখ্যার হার বেড়েই চলেছে। অথচ মানুষের প্রয়োজনে কলকারখানাও গড়ে তুলতে হবে। কাজেই জলাভাব দূর করার জন্য আমাদের জলসংরক্ষণ করা উচিত। তাই নীচের বিষয়ের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে।

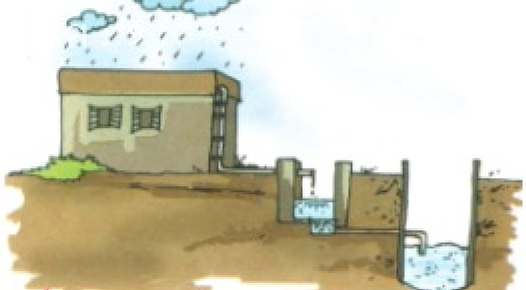

চিত্র ১৬.৭ বর্ষাজল সংরক্ষণ

- অধিক পরিমাণে অযথা জল ব্যবহার না করা ও নষ্ট না করা।
- জলের উৎসগুলি প্রদূষণ কমানোর জন্য তৎপর হওয়া।
- বৃষ্টির জল গ্রামাঞ্চলে ছোট জলভাণ্ডারে জমিয়ে রাখা।
- শহরাঞ্চলে পাকা বাড়ির ছাদে জমে যাওয়া বৃষ্টির জল যাতে বয়ে না যায় সেজন্য গর্ত করে সেই জল জমিয়ে রাখা।

কী শিখলাম?

- জল ছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে না।
- জলের কয়েকটি উৎসস্থল জলকূপ, কূপ, পুকুর, নদী, হ্রদ ইত্যাদি।
- প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা, আবার অনাবৃষ্টিতে খরা।
- জলের প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে। সুতরাং জলের সদ্ ব্যবহার করা উচিত।

অভ্যাস

১. পৃথিবীর উপরিভাগে দুই-তৃতীয়াংশ জল রয়েছে তবু জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ বর্ণনা করো।

২. প্রথম শব্দদ্বয়ের সম্পর্ক মনে করে তৃতীয় শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ লেখো।

অধিক বৃষ্টি	:	বন্যা	অনাবৃষ্টি: ———
পুকুর	:	মধুর	সমুদ্র : ———
জল শোষণ	:	শিকড়	জলমোচন : ———
জলচর প্রাণী	:	মাছ	জলজ উদ্ভিদ : ———

৩. জঙ্গল কেটে দেওয়ার ফলে বৃষ্টির পরিমাণ আশানুরূপ হয় না বলে কেন বলা হয়?

৪. কী কী পদক্ষেপ নিলে খরার সম্ভাবনা কম হবে?

৫. জলের অপব্যয় কমানোর তিনটি উপায় কী?

বাড়িতে বসে করো:

- তোমার অঞ্চলের জলের উৎসগুলির নাম লেখো। এইগুলিতে গ্রীষ্মঋতুতে কীভাবে জল পাওয়া যাবে তার এক প্রকল্প প্রস্তুত করো।

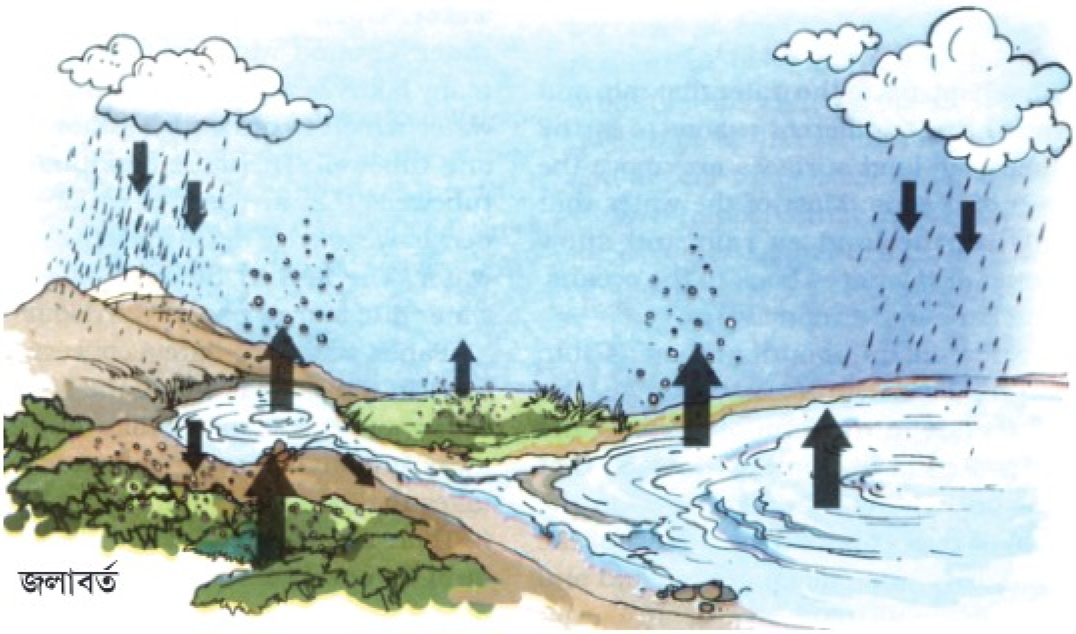

জলাবর্ত

সপ্তদশ অধ্যায়

জীবজগতের জন্য বায়ুর গুরুত্ব

আমরা মাঝে মাঝে গাছের পাতা পড়তে দেখি। কিন্তু পাতাটিকে কে নাড়িয়ে দেয়? আমাদের শরীরের আরামের জন্য হাতপাখা ঘোরাই। বায়ু আমাদের যে সব কাজে লাগে তার এক তালিকা তৈরি করে তোমার খাতায় লেখো।

১৭.১ বায়ুর গুরুত্ব

বায়ুর অন্যতম উপাদান অম্লজান যা দহনে সহায়ক। দহন থেকে তাপশক্তি পাওয়া যায়। তেমনি আমাদের শরীরে খাদ্য দহনে শক্তি পাওয়া যায় কি? শুধু আমাদের নয়, প্রত্যেক জীবের জীবকোষে একপ্রকার পরিপাক প্রক্রিয়ায় শক্তি পাওয়া যায়। আমরা যা খাই তা অম্লজানের দ্বারা পরিপাক হলে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে আমরা শ্বসন বলি। কিন্তু অম্লজান খাদ্য দহন করে শক্তি দেওয়ার সময় অঙ্গারকাম্ল নির্গত হয়। আবার বায়ু থেকে অঙ্গারকাম্ল বা কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয় উদ্ভিদজগৎ। **অম্লজান বা অক্সিজেন আহরণ ও অঙ্গারকাম্ল বা কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগের প্রক্রিয়াকে শ্বাসক্রিয়া বলা হয়। সুতরাং শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অংশবিশেষই শ্বাসক্রিয়া।**

বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে নাইট্রোজেন গ্যাস। অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে।

তোমার কাজ: ১

শ্বাসক্রিয়ায় অম্লজান আবশ্যক।

১৭.১ শ্বাসক্রিয়ায় অক্সিজেন আবশ্যক।

দুটি কাচের বা প্লাস্টিকের বোতল নাও। প্রত্যেকটিতে কিছু গজামুগ বা ফুলের পাপড়ি ঢোকাও। বোতলের ছিপি বন্ধ করে এটি একটি জায়গায় রেখে দাও। পরের দিন একটি বোতলের ছিপি খুলে তার মধ্যে একটি জ্বলন্ত কাঠি ঢোকাও। কী দেখলে? কাঠিটি নিভে গেল। শিশির ভিতরে অম্লজান শেষ হওয়াতে কাঠিটি নিভে গেল। দ্বিতীয় বোতলের ছিপি খুলে একটু পরিষ্কার চুনের জল পূরণ করো। ছিপি বন্ধ করে নাড়াও। চুনের জলের রং কী বদলাচ্ছে দেখো, চুনের জলের রং দুধের মতো সাদা হয়ে গেছে। কারণ উদ্ভিদ শ্বাসক্রিয়ার জন্য বায়ু থেকে অম্লজান নেয় ও অঙ্গারকাম্ল ছাড়ে।

১৭.২ জলজ উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া।

এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যারা জলে বাস করে। এদের জলজ উদ্ভিদ বলা হয়। কিছু আছে সূক্ষ্মভাসমান উদ্ভিদ। এদের ভাসমান বা প্লব (Phlankton-ফ্ল্যাঙ্কটন) উদ্ভিদ বলা হয়। এরা প্রায় জলের উপরে ভেসে বেড়ায়। এছাড়া কিছু জলের মধ্যে ডুবে থাকে ও কিছু জলের উপরে ভেসে বেড়ায়। পদ্ম ও শালুক প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের মূল জলের ভিতরে পাঁকের মধ্যে থাকে। কিন্তু পাতা ও ফুল জলের উপরে থাকে। কচুরিপানা, শ্যাওলাপানা, বিলাতিপানা জলে ভাসে। জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত অম্লজান গ্রহণ করে।

চিত্র ১৭.২ কচুরিপানার দল

এরা বিসারিত প্রক্রিয়ায় অম্লজান ও অঙ্গারকাম্ল গ্যাস বিনিময় করে। পত্রছিদ্র দ্বারা শালুক ও পদ্ম অম্লজান

গ্রহণ করে। কিন্তু ডুবে থাকা উদ্ভিদের পাতায় ছিদ্র থাকে না। লবণাক্ত জলাভূমিতে নোনা উদ্ভিদ দেখা যায়। এসব উদ্ভিদ মাটির ভিতর থেকে বেশি পরিমাণে জল পায় না বলে এদের একপ্রকার মূল মাটির উপরে উঠে আসে। মূলের অগ্রভাগে থাকা রন্ধ্র দিয়ে এরা বায়ু থেকে অম্লজান গ্রহণ করে।

১৭.৩ জলচর প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়া

প্রাণীরা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে। অ্যামিবার মতো এককোষী প্রাণী ও হাইড্রা মিষ্টিজলে থাকে। এরা জলে দ্রবীভূত অম্লজান বিসারণ প্রক্রিয়ায় সোজাসুজি কোষের মধ্যে নেয়।

কাঁকড়া, চিংড়ি, গুগলি, শামুক এবং মাছ ফুলকার সাহয্যে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করে। তুমি কি মাছের ফুলকা দেখেছ?

তোমার কাজ: ২

একটি জীবন্ত মাছকে জল থেকে তুলে এনে তার ফুলকা দেখো। ফুলকার উপরের ঠোঁটটি খোলে ও বন্ধ হয়।

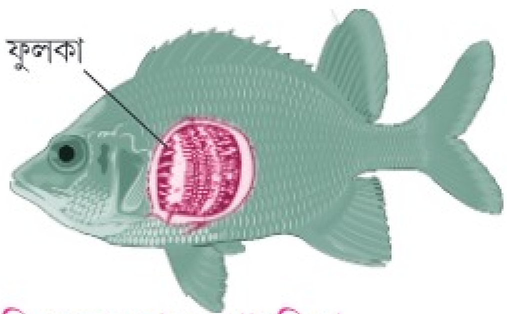

চিত্র ১৭.৩ মাছের শ্বাসক্রিয়া

কিন্তু অন্য একটি মরা মাছ এনে দেখো তার ফুলকা বন্ধ বা খুলছে কি না?

১৭.৪ স্থলভাগে থাকা উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া

কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড, কিছু উদ্ভিদের মূল ও অধিকাংশের পাতার স্তোমগুচ্ছশির অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারকাম্ল ত্যাগ করে।

আম, জাম, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছের পাতার নীচের অংশে অনেক স্তোমগুচ্ছশির থাকে।

ওড়শমারী (Cyas) কনিয়র পাতার স্তোমকে নিমগ্ন স্তোম (Sunken) বলে।

রাস্না জাতীয় গাছ বা অর্কিড গাছ অন্য গাছের উপর নির্ভর করে বেড়ে ওঠে। এসব গাছের মূল বায়ুতে ঝুলতে থাকে। বায়ু থেকে এরা জলীয় বাষ্পে দ্রবীভূত অম্লজান গ্রহণ করে।

চিত্র ১৭.৫

১৭.৪ মাটির উপরিস্থিত জীব

আমরা জানি, মাটিতে অনেক অণুজীব থাকে। উর্বর মাটিতে যবক্ষরজান বিবন্ধক আজোটো ব্যাক্টর ক্লাস্টিডিয়াম ইত্যাদি জীবাণু থাকে।

১৭.৫ স্থলচর প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়া।

স্থলভাগের প্রাণীদের মধ্যে আরশোলা, টিকটিকির শরীর বিখণ্ডিত (Segmented) অঙ্গের মধ্যেও শ্বাসরন্ধ্র থাকে।

আরশোলা

চিত্র ১৭.৬ আরশোলার শ্বাসরন্ধ্র

বায়ু শরীরের মধ্যে শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে ও পরে জীবকোষের শ্বসন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

সাপ, পায়রা, হাঁস, মানুষ, বাদুড় ইত্যাদির ফুসফুস এক বিশেষ অঙ্গ। তাকে শ্বাসযন্ত্র বলা হয়।ফুসফুসের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু নাসাপথ দিয়ে প্রবেশ করে ও বাইরে বের করে।

অলিভরিডলে কচ্ছপ, কুমিরের মতো প্রাণীর শ্বাসক্রিয়া ফুসফুসের সাহায্যে হয়। শীতকালে ব্যাঙ কোথায় থাকে? তখন সে কীভাবে নিশ্বাস নেয়। ব্যাঙ শীতকালে অধিকাংশ সময় মাটির নীচে থাকে। তখন যে চর্ম দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করে।

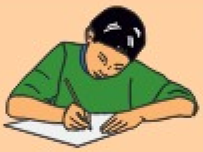

কী শিখলাম?

- জীবজগতের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু একান্ত প্রয়োজন।
- বায়ুতে অম্লজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারকাম্ল ইত্যাদি গ্যাস থাকে।
- সর্বত্র উদ্ভিদ ও প্রাণী নিশ্বাস-প্রশ্বাস অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারকাম্ল ত্যাগ করে।
- মানুষ, বাঘ, হাতি, তিমি, খরগোশ, কুমির, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীরা ফুসফুস দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে।
- মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণী ফুলকার সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া করে।
- টিকটিকি, কেঁচো, আরশোলা ইত্যাদি প্রাণীরা তাদের কর্তিত অঙ্গের রন্ধ্রপথ দিয়ে শ্বাসক্রিয়া করে।
- উদ্ভিদ পাতায় যে স্তোম থাকে তার মাধ্যমে শ্বাসকার্য করে।
- কিছু উদ্ভিদ শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করে গাছের গোড়া থেকে ও কিছু বায়ুতে ঝুলে থাকা শিকড়ের সাহায্যে।

অভ্যাস

১. বাতাসে অম্লজান এক-পঞ্চমাংশ ও অঙ্গারকাম্ল তিন সহস্রাংশ আছে। এই অনুপাত কম বেশি হলে জীবজগতের উপরে এর কী প্রভাব পড়বে, চারটি বাক্যে লেখো।

২. প্রথম দুটি শব্দের সম্পর্ক দেখে তৃতীয় শব্দ সহ সম্পর্কিত শব্দ লেখো।

(ক) মাছ : ফুলকা — হাঁস : ....

(খ) কেঁচো : চর্ম — আরশোলা : ....

(গ) অর্কিড : মূল — অশ্বত্থ: ....

(ঘ) মানুষ : ফুসফুস — উদ্ভিদ : ....

৩. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও।

(ক) মাছ কীভাবে শ্বাস গ্রহণ করে?

(খ) অর্কিড কীভাবে শ্বাস গ্রহণ করে ?

(গ) ব্যাঙ শীতকালে কীভাবে শ্বাস গ্রহণ করে ?

৪. কারণ লেখো।

(ক) জল থেকে মাছকে বের করে আনলে কিছুক্ষণ পরে মরে যায়।

(খ) ব্যাঙ একপ্রকার উভচর প্রাণী।

(গ) কেঁচো মাটির ভিতরে থাকলেও নিশ্বাস নিতে পারে।

৫. 'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের শব্দ মেলাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
কচ্ছপ	শ্বসন মূল
সুন্দরীবৃক্ষ	কাণ্ড
অম্লজান	উদ্ভিদ
অঙ্গারকাম্ল	নিশ্বাস
স্তোম	শিকড়
	ফুলকা
	প্রশ্বাস
	ফুসফুস
	চর্ম

বাড়িতে বসে করো:

● ফুসফুসের এক মডেল তৈরি করো।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আবর্জনা

তোমার বাড়িতে প্রতিদিন ঝাঁট দিতে তুমি দেখেছ। বৈঠকখানা, বারান্দা ও রাস্তাঘাট ঝাঁট দিতেও দেখেছ। তুমি স্কুলে এসে শ্রেণীগৃহে বসার আগেও ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেওয়া পদার্থগুলিকে আবর্জনা বলা হয়। এগুলি তুমি আবর্জনা স্তূপে ফেলে দাও।

বাড়ি, স্কুলের শ্রেণীগৃহ, বাগান এবং রাস্তার আবর্জনার মধ্যে তুমি কী কী বস্তু দেখো তোমাদের মধ্যে আলোচনা করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১৮.১ আবর্জনা কাকে বলে ?

তোমার তৈরি করা তালিকার বস্তুগুলি তুমি ফেলে দাও কেন ? যেসব বস্তু সাধারণত আমরা ব্যবহার করি না ও আমরা ফেলে দিই তাকে আবর্জনা বলি। যেমন—ছেঁড়া কাগজ, চকলেট জরি, বেগুনের বোঁটা, সবজির খোসা ইত্যাদি। আজকাল আধুনিক পদ্ধতিতে কিছু আবর্জনা আমাদের ব্যবহারের উপযোগী করা হচ্ছে। যেমন—গরু ও মহিষের গোবরের সার ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এসব থেকে উৎপন্ন গ্যাস আবার রান্নার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুরগির মলও খত রূপে ব্যবহার করা হয়।

১৮.২ আবর্জনা কোথায় পাওয়া যায় ?

এসো এবার জেনে নিই কোন্ কোন্ জায়গা থেকে আবর্জনা বেরোয়। তোমার জানা কতকগুলি জায়গার নাম বলো। ওই জায়গা থেকে যে যে আবর্জনা বের হয় তা ১৮.১ সংখ্যক সারণী অনুসারে পূরণ করো।

সারণী ১৮.১ আবর্জনা যে স্থানে সৃষ্টি হয়।

স্থান	সৃষ্ট আবর্জনা
বিদ্যালয়	বাদামের খোসা, চকলেট জরি, কাগজের টুকরো।
বাড়ি	
রান্নাঘর	
মন্দির	
হাট	
বাস/ট্রেন	
গোয়াল	
হাসপাতাল	
কলকারখানা	

১৮.৩ আবর্জনার শ্রেণীবিভাগ

আবর্জনা দেখলে বোঝা যায় যে সব আবর্জনা কিন্তু সমান ধরনের নয়। বিভিন্ন পর্যায়ের আবর্জনা হতে পারে। আমরা এই ভাবে তাদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। যথা: কঠিন ও নরম আবর্জনা, অজৈবিক ও জৈবিক আবর্জনা, অবক্ষয় জাতীয় ও অবক্ষয় না হওয়া আবর্জনা এবং পুনঃ চক্রণক্ষম ও পুনঃ চক্রণঅক্ষম আবর্জনা। পুনরায় চক্রাকারে সেই আবর্জনা ব্যবহার করা যেতে পরে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা হয় না।

আবর্জনা পরিচালনার জন্য আমাদের পুনরায় ব্যবহার উপযোগী আবর্জনা সংগ্রহ করা উচিত।

কাগজ, কাচ, ধাতব পদার্থ, প্লাস্টিকের তৈরি বস্তুগুলি পুনর্বার কারখানায় পাঠিয়ে দিলে তা পুনরায় ব্যবহার উপযোগী হবে।

তোমার কাজ: ১

তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পুনরাবর্তনযোগ্য পদার্থ বা পুনর্বার ব্যবহার অযোগ্য পদার্থ কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। পুনরাবর্তনযোগ্য পদার্থ একটি পিচবোর্ডের বাক্সে ও পুনরায় ব্যবহারের অযোগ্য পদার্থকে অন্য একটি পিচবোর্ডের বাক্সে রাখো। এবার ১৮.২ সংখ্যক সারণীটি পূরণ করো।

সারণী ১৮.২

পুনরাবর্তনযোগ্য আবর্জনা	পুনরাবর্তন অযোগ্য আবর্জনা
প্লাস্টিক জিনিস পলিথিন থেকে তৈরি জিনিস	হাসপাতালের সংক্রমিত আবর্জনা

চিত্র ১৮.১ আবর্জনা

তোমার কাজ: ২

তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে স্কুলে, বাড়িতে ও হাটে দেখতে পাওয়া আবর্জনা নিয়ে একটি তালিকা করো। তার মধ্যে জৈব নিম্নীকরণ যোগ্য ও জৈব নিম্নীকরণ অযোগ্য আবর্জনাগুলির নিম্নে প্রদত্ত সারণীর মতো তোমার খাতায় ১৮.৩ নম্বর সারণী তৈরি করে লেখো।

সারণী ১৮.৩

জৈব নিম্নীকরণ যোগ্য আবর্জনা	জৈব নিম্নীকরণ অযোগ্য আবর্জনা
সবজির খোসা	ভাঙা কাচ

তুমি কোন্ কোন্ আবর্জনা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবে আলোচনা করে ১৮.৪ সারণী অনুযায়ী একটি তালিকা করো।

সারণী ১৮.৪

আবর্জনার নাম	আবর্জনা থেকে প্রস্তুত পদার্থ
সবজির খোসা	আচার, সার
পানমশলার কৌটো	
ফিউজ বাল্ব	
নারকেল মালা	
ডিমের খোলা	
দেশলাই বাক্স	

১৮.৪ আবর্জনার অবক্ষয় পরীক্ষণ

তোমার কাজ: ৩

তোমার বাড়ি বা স্কুলের কাছে দেওয়াল বা বেড়ার কোণে দু'টি গর্ত করো। গর্তের আকার ২ ফুট শ্র ১ ফুট শ্র ১ ফুট করো।

প্রথম গর্তে সবজির খোসা, বেড়ে যাওয়া খাদ্য, মাছের আঁশ, বিস্কুট, পাঁউরুটি, পচে যাওয়া ফল,গোবর আজেবাজে গাছ, কাগজ ঠোঙা, গোমূত্র ইত্যাদি ফেলো। দ্বিতীয় গর্তে চকলেট জরি, টিনের ডিবা, প্লাস্টিক কৌটো, ভাঙা খেলনা, টুকরো ধাতব পদার্থ, ভাঙা কাঁচ (লন্ঠন), ব্যাটারি, ছেঁড়া তার, অব্যবহার্য বাল্ব, ছেঁড়া জুতো ইত্যাদি ফেলো।

গর্তের উপরে মাটি ফেলে বন্ধ করে দাও। ১৫ দিন ছেড়ে দাও কেবল মাঝে মাঝে তার উপরে জল ঢালো। ১৫ দিন পরে কী পরিবর্তন হয়েছে দেখো। যা দেখলে তা কেন হল বলে মনে করো। এক মাস পরে দেখলে আরও কিছু পরিবর্তন আশা করো কি?

পরিবর্তনে কী দেখলে?

- কোন্ পদার্থগুলি পচে গেছে?
- কোন্ পদার্থ থেকে গন্ধ বেরোয়নি?
- কোন্ পদার্থ থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে?
- কোন্ পদার্থের কিছু পরিবর্তন হয়নি?

● কোন্ পদার্থের কিছু পরিবর্তন হয়নি ?

নীচের ১৮.৫-এর সারণীতে কোন্ আবর্জনা কতদিনে ক্ষয় হয় তার হিসাব দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১৮.৫ আবর্জনা ক্ষয়ের মোটামুটি সময়

আবর্জনা	মোটামুটি সময়
পচা ফল সবজির খোসা	৬ থেকে ১৫ দিন
ছেঁড়া কাগজ	১০ থেকে ৩০ দিন
কাপড় তুলো	৩ থেকে ৫ মাস
পশমের কাপড়	১ বছর
কাঠ	১০ থেকে ১৫ বছর
প্লাস্টিক থলি	১ নিযুত বছর
টিন, অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পদার্থ	১০০ থেকে ৫০০বছর
কাচ	অবক্ষয় হয় না

১৮.৫ প্লাস্টিক আমাদের আশীর্বাদ না অভিশাপ

প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিকের ব্যবহার মানুষ ও জীবজন্তুদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ এগুলি ব্যবহার করার পরে তা প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজে নষ্ট হয় না। ফলে চারপাশে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্লাস্টিক খেলনা, কলম, চিরুনী, টুথব্রাশ, বালতি, মগ, বোতল, চেয়ার, পাইপ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

গাড়ি, বাস, রেডিও, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নির্মাণেও প্লাস্টিকের ব্যবহার হয়।

সাবধানতা

- প্লাস্টিক কম ব্যবহার করা উচিত।
- কখনও কখনও ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের থলি ইত্যাদি গরু খেয়ে ফেলে। ফলে তাদের পেটে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কাজেই প্লাস্টিক থলিতে কোনো খাদ্য বা সবজির খোসা মুড়ে ফেলা উচিত নয়।
- খাদ্য প্যাকেটগুলি মাঝে মাঝে গরম হয়ে গেলে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়। সেই খাদ্য খেলে আমাদের পেট খারাপ হয়। সুতরাং প্যাকেটের বেশিদিনের খাদ্য খাব না।
- প্লাস্টিক পদার্থ জ্বালাব না। প্লাস্টিক জ্বললে বায়ু দূষিত হয়।
- দোকান থেকে বিভিন্ন জিনিস আনার সময় দোকানিকে পলিথিনের বদলে কাগজের ঠোঙাতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা উচিত।

কী শিখলাম:

- যে বস্তুগুলি সাধারণত আমরা ব্যবহার করি না সেগুলিকে আবর্জনা বলা হয়।
- আমাদের চারপাশে আবর্জনা সৃষ্টি হয়। যথা: আমাদের ঘর, গোয়ালঘর, বিদ্যালয়, মন্দির, হাট, মাঠ, ডাক্তারখানা, কলকারখানা ও যানবাহনের যাতায়াতের দরুন ও কৃষিজাত পদার্থ থেকে।
- আবর্জনাকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।
  যেমন: (১) জৈবিক আবর্জনা ও (২) অজৈবিক আবর্জনা।
- কিছু আবর্জনা পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়।
- বিভিন্ন আবর্জনার অবক্ষয়কাল ভিন্ন ভিন্ন।
- কিছু আবর্জনার অবক্ষয় নেই।
- প্লাস্টিক আমাদের জন্য যত উপযোগী, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।

অভ্যাস

১. কারণ উল্লেখ করো।

(ক) শাকসবজির খোসা এখানে-সেখানে না ফেলে মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া।

(খ) প্লাস্টিক পোড়াব না, রাস্তায় ফেলব না।

২. প্রথম শব্দদ্বয়ের সম্পর্ক দেখে তৃতীয় শব্দসহ সম্পর্কিত শব্দটি লেখো।

(ক)	শাকসবজির খোসা	:	জৈবিক	প্লাস্টিক ————
(খ)	ছেঁড়া কাগজ	:	১০-৩০ দিন	কাঠ ————
(গ)	শাকসবজি	:	খোসা	চকলেট ————
(ঘ)	বিদ্যালয়	:	টুকরো কাগজ	রান্নাঘর ————

৩. আবর্জনা বলতে কী বোঝায়? তোমার গ্রাম বা শহরের আবর্জনাকে কীভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত করা যায়, সংক্ষেপে লেখো।

৪. সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখো।

(ক) জৈবিক আবর্জনা

(খ) আবর্জনা থেকে প্রস্তুত উপযোগী সামগ্রী

৫. একটি করে সামঞ্জস্য ও পার্থক্য লেখো।

জৈবিক আবর্জনা ও অজৈবিক আবর্জনা

বাড়িতে বসে করো:

- তোমার বাড়ি থেকে যে সব আবর্জনা বেরোয় সেগুলির একটি তালিকা করো। সাতদিনের মধ্যে কত বেরোয় তার আনুমানিক পরিমাণ নির্ণয় করো। এর সদ্ব্যবহার কীভাবে করবে লেখো।